সম্পূর্ণ উপন্যাস
অজানা রঙ
অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম প্রকাশ

১২ মাঘ ১৩৮৯ ● ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩
৮ বর্ষ ● ২১ সংখ্যা

বৈদ্যুতিন প্রকাশক

https://kheladhulo.blogspot.com

পরিকল্পনা -সুজিত কুন্ডু ০ রূপায়ন -স্নেহময় বিশ্বাস

সম্পূর্ণ উপন্যাস

অজানা রঙ

অদ্রীশ বর্ধন

না। কেউ বেঁচে নেই। একজন ছাড়া। আতঙ্ক আজও বিরাজ করছে রহস্যময় সেই উপত্যকায়। হিমালয়ের ফুল, ফল, গাছে ছাওয়া অপরূপ সুন্দর অথচ ভয়াল ভয়ঙ্কর সেই পাণ্ডববর্জিত উপত্যকায় আজও রহস্য নিবিড় হয়ে রয়েছে আকাশে, বাতাসে, পাথরে, ধূলিতে, ঘাসে, পাতায়, গাছে গাছে। আজও কেউ সেই অঞ্চলের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

একজন ছাড়া। সে-ই কেবল বেঁচে আছে। আজও। শুধু বেঁচেই নেই। কিম্ভূত আকৃতি নিয়ে যেন যক্ষের মতো রহস্য-উপত্যকার নিগূঢ় প্রহেলিকা আগলে বসে রয়েছে। আজও ! আজও ! আজও !

তার কাছেই আমি শুনেছিলাম।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শুনেছিলাম কীভাবে অজস্র রঙের রাজ্য সেই ভূস্বর্গে অকস্মাৎ এক নিশীথে হানা দিয়েছিল মহাশূন্যের আগন্তুক সেই রঙ। একটি মাত্র রঙ। অপার্থিব, অলৌকিক, বিজ্ঞানের জানা বর্ণালির বাইরের রঙ। কীভাবে আকস্মিক তমিস্রায় ঢেকে গিয়েছিল দিগ্‌দিগন্ত, পাহাড়চূড়া, বৃক্ষশীর্ষ। কীভাবে তারকাখচিত মহাকাশের সিগনাস নক্ষত্রের দিক থেকে অকল্পনীয় গতিবেগে আবির্ভূত হয়েছিল পুঞ্জীভূত ছায়ার মতো নিরেট কালো একটা বাক্স। কীভাবে সহসা ঝড় উঠেছিল। মত্ত প্রভঞ্জনে গাছেরা হেলে পড়েছিল একই দিকে—সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। কীভাবে আচম্বিতে পুঞ্জিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আবির্ভাবে জ্যোৎস্নাময়ী বিধুসুন্দরীর রজতশুভ্র আনন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কীভাবে লকলকে অগ্নিশিখার মধ্যে বিদ্যুৎশিখা মুহুর্মুহু ধেয়ে এসেছিল বজ্রগর্ভ সেই মেঘের বুক চিরে—একই দিকে—ভূস্বর্গের মতো, হিমালয়ের বুকে নন্দনকাননের মতো সেই নয়নসুন্দর বর্ণোজ্জ্বল উপত্যকার দিকে। তারপর একদিন সব রঙ কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই রঙ—অপার্থিব অজানা বর্ণালি-বহির্ভূত লক্ষ যোজন পথ পাড়ি দিয়ে আসা একটি মাত্র লুঠেরা রঙের করাল গ্রাসে অন্তর্হিত হয়েছিল হাজার রঙের সুষমা। লোমহর্ষক, ভয়াবহ, পাগল করে দেওয়া, মন-বুদ্ধি-যুক্তি কেড়ে নেওয়া একটি মাত্র অবর্ণনীয় বিচিত্র রঙের মারণ খেলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আজকের সেই মৃত্যু-উপত্যকায়। গাছে গাছে পাতায় পাতায় ধুলোয় মাটিতে পাথরে বাতাসে নেচে নেচে বিচ্ছুরিত হয়েছিল নামহীন পরিচয়হীন গোত্রহীন, বিজাতীয় বিদেশী সেই প্রলয়ংকর রঙের খেলা। একে একে

উধাও হয়ে গিয়েছিল মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ। আবার ফিরে এসেছিল এক থেকে দুই হয়ে দুই থেকে চার হয়ে। একই আকার নিয়ে, কিন্তু রকমারি আয়তন, রকমারি প্রকৃতি নিয়ে। সৃষ্টি যেন সহসা উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল আজকের সেই ধু-ধু প্রান্তরে।

তারপর আর কিছুই ছিল না। বাতাসের হুহুংকার আজও শোনা যায় শীতার্ত রাত্রে, আজও যেন চুপিচুপি দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাছপালা, আশপাশের বাতাস যেন মাঝে-মাঝে ককিয়ে কেঁদে ওঠে। আজও বরফ পড়ে বরফ পড়ার সময়ে—কিন্তু রহস্য-থমথমে প্রেত-উপত্যকার মতো নিথর, নিস্তব্ধ, নির্জন সেই উপত্যকার ঠিক মাঝখানে সুবৃহৎ চৌকোনা বর্গক্ষেত্রে বরফ জমে না, ঘাস গজায় না, পাখি উড়ে যায় না, পোকামাকড় দেখা যায় না। পরিত্যক্ত চৌকোনা সেই কবোষ্ণ বর্গক্ষেত্রের কিনারায়, শ্মশান-ক্ষেত্রের পাশে ঝুপড়ির মধ্যে আজও দিনের পর দিন রাতের পর রাত যেন পাহারা দিয়ে যায় সে একা···কিসের প্রতীক্ষায়, কিসের প্রত্যাশায়, কিসের নির্দেশে—তা শুধু সে-ই জানে।

কেউ তা জিজ্ঞেস করতেও যায় না তার কাছে। সমাজ-পরিত্যক্ত মহাশ্মশানের রক্ষককে এড়িয়ে যায় গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ। কিন্তু গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে প্রত্যেকেই বলে একই কথা। সে জানে! সে জানে! সে জানে! সঠিক কী ঘটেছিল চল্লিশ বছর আগে একদা আশ্চর্য সুন্দর সেই প্রকৃতির রঙ-নিকেতনে, কী কারণে আজ তা দিবালোকে ধূসর, কিন্তু একদা ছেয়ে যেত রাতের অমানিশায় নারকীয় রঙের প্লাবনে—শুধু সেই জানে। কিন্তু কেউ যায় না সেখানে দিনের আলোয় অথবা রাতের আঁধারে—কারণ সেখানে যে অজানা আতঙ্ক দানা বেঁধে রয়েছে প্রতিটি অণু-পরমাণুতে, আজও তার সঠিক ব্যাখ্যা হয়নি—

তা ছাড়া, একমাত্র জীবিত সেই মানুষটাও যে আর আগের মতো নেই। হ্যাঁ, মানুষ সে আজও। আজও তার দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা, দুটো চোখ, দুটো কান, একটা নাক। কিন্তু আগের মতো আর নয়। একেবারেই নয়। তবুও তো সে মানুষ। নাকি অমানুষ? অতিমানুষ? অথবা মানুষের দেহাকারে শরীরী আতঙ্ক? অজানা বর্ণের অব্যাখ্যাত ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তিত বিজ্ঞানের অজ্ঞাত অন্য এক জীব? যার অস্থি-মজ্জায় রক্তে-মাংসে বাসা নিয়েছে মহাকাশ থেকে ধেয়ে-আসা অজানা সেই রঙ? যার দেহ আজ সেই রঙের আধার? যে রঙকে পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন চেনেনি, দেখেনি, জানেনি?

তাই সেই উপত্যকা আজও পরিত্যক্ত। রক্ত-হিম-করা ছমছমে নীরবতা বিরাজমান সেখানে অষ্টপ্রহর।

কিন্তু আমি গেছিলাম। একাই গেছিলাম। না গিয়েও উপায় ছিল না। গ্রামের লোক, শহরের লোক—সব্বাই আঁতকে উঠেছিল আমার অভিপ্রায় শুনে। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তুষার-প্রান্তরের শ্বেতশুভ্র বরফের ছোঁয়ায় যেন কনকনিয়ে কেঁপে উঠেছিল। নিঃসীম উৎকণ্ঠায়, নিরতিশয় উদ্বেগে পাণ্ডুর মুখে বার বার নিষেধ করেছিল যাবেন না, যাবেন না, যাবেন না। পরদেশী পর্যটক, হিমালয়ের কন্দরে উপত্যকায় গিরিবর্ত্মে, গুহায় অনেক সৌন্দর্য, অনেক প্রহেলিকা আছে। সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষ আপনি, শিল্পের সাধক পথের পথিক আপনি—সেই সব সৌন্দর্য অন্বেষণ করেও এক জীবনে শেষ করতে পারবেন না—কেন যাবেন মৃত্যুর চুম্বনে, আতঙ্কের আলিঙ্গনে নিষ্প্রাণ সেই উপত্যকায়? কী আছে সেখানে?

তবুও আমাকে যেতে হয়েছিল। যাব বলেই যে এসেছিলাম। পর্যটন আমার ছলনা। পর্যটকের বেশ আমার ছদ্মবেশ। আমি যে সামরিক-পুরুষ। প্রতিরক্ষার স্বার্থে, দেশের স্বার্থে

গিরি-গুহা-কন্দর-উপত্যকার মাঝ দিয়ে পথনির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েই যে আবির্ভাব আমার। গোপন অভিসন্ধির বৃত্তান্ত তাই কাউকে বলতে পারিনি। আত্মপরিচয় দিতে পারিনি। জরিপ করে, সরেজমিন তদন্ত করে, প্রতিবেদন পেশ করতেই হবে আমাকে। দেশরক্ষায় নিবেদিত-প্রাণ সামরিক-পুরুষের কাছে মৃত্যুভয়, অশরীরীর আতঙ্ক, অজানা রঙের বিভীষিকা অথবা মৃত্যু-উপত্যকার করাল কাহিনী তাই কিছুই নয়। যেতে আমাকে হতই, রিপোর্ট রচনাও করতে হত। তাই গিয়েছিলাম। রিপোর্ট লিখতেও বসেছি। কিন্তু বেশ বুঝছি আমার লৌহকঠিন স্নায়ু আর স্থির নয়, আমার স্নায়ুর কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়েছে অজানা আতঙ্ক, শিহরন জাগছে লোমকূপে লোমকূপে। হাত কাঁপছে, লেখা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভাষা সাবলীলতা হারিয়ে ফেলছে। তবুও আমাকে লিখে যেতে হবে। অবিশ্বাস্য এই প্রতিবেদন পাঠের পর সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাকে উন্মাদাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও নিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই মানুষগুলোর কাহিনীর পেছনে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যথাসাধ্য—আমার জ্ঞানে যদ্দুর কুলোয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে যতদূর সম্ভব প্রতিবেদনটাকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলবার চেষ্টা করব। কিন্তু পারব কি ? মহাকালকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ক্লোনিং-দূরকল্পনাকে সম্ভবপর করে তুলে জেনেটিক মিউটেশনকে বাস্তবে রূপায়ণ করে ঐ যে মানুষটা গত চল্লিশ বছর ধরে সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলীর পানে তাকিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চৌকোনা বর্গক্ষেত্রকে পাহারা দিয়ে চলেছে—তার কিম্ভূত আকৃতি বারে বারে পুঞ্জীভূত আতঙ্ক কুহেলির মতো আবর্ত রচনা করে চলেছে আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে—যুক্তি-বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে, গুছিয়ে লিখতেও পারছি না—পরের কথা আগে চলে আসছে, আগের কথা চলে যাচ্ছে পরে···

সে কিন্তু আমাকে ভয় দেখায়নি। আমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেনি। আমার মূল অভিসন্ধি স্বমুখে ব্যক্ত না করলেও তার বিচিত্র সত্তায় তা অনুরণিত হয়েছিল কি না তাও জানতে পারিনি—তবে আমার মানবিক সত্তায় একটা আবছা অনুরণন জাগ্রত হয়েছিল। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি সজাগ করে দিয়েছিল আমার শিরা-উপশিরা ধমনী, অস্থিমজ্জার প্রতিটি অণু-পরমাণুকে—সে জানে ! সে জানে ! সে জানে ! আমার ছলনা অজ্ঞাত নয় তার কাছে। আমার অভিপ্রায়ের অন্তরালে নিহিত অভিসন্ধি অজানা নয় তার কাছে। কিন্তু তবুও সে হাসেনি, মুখে চাবি দিয়ে থাকেনি, ভয়াল ভ্রুকুটি দিয়ে আমার অন্তরাত্মাকে শিহরিত করে তুলতে চায়নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা ছবির মতো বর্ণনা করে গেছিল। তার সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ কথামালা যেন ছবি-পরম্পরা হয়ে ভেসে উঠেছিল আমার মনের চোখে···মোহাবিষ্টের মতো আমি তন্ময় শুনে গিয়েছিলাম··· প্রেতাবিষ্টের মতো রোমাঞ্চিত-কলেবর হয়েছিলাম···চল্লিশটা বছর যেন নিমেষ মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল···নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল···চল্লিশ বছরের ব্যবধান অজ্ঞাতসারেই লক্ষ দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম যেন সশরীরে ক্রুর-কুটিল যুক্তি-বুদ্ধি-দেহ-মন কেড়ে নেওয়ার সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলির মুহূর্তে—বর্ণনার জাদুমন্ত্রে আমি যেন প্রত্যক্ষ করেছিলাম ঝড়, বিদ্যুৎ, মেঘ··· আর সেই কালো বাক্সটাকে !

তখন সেই উপত্যকায় সবুজ ঘাস ছিল, স্বর্গোদ্যানের মতো অজস্র ফুলের সমারোহ ছিল, চার পাশের পাহাড়গুলোর ওপরেই ঘন সবুজ পাইন অরণ্যের মাঝে-মাঝে দেখা

যেত রঙের ঝিকিমিকি। সূর্য উঠলে, পাহাড়ের গা বেয়ে সোনালি কিরণের ঢল নামলে অজস্র রঙিন প্রজাপতির মেলা আরম্ভ হয়ে যেত। একটিই গ্রাম ছিল উপত্যকায়। তার পরের গ্রামটি পাহাড়ের ওপারে—পাকদণ্ডী বেয়ে যেতে হত। শহরটা ঠিক বিপরীত দিকে—পাহাড়-বলয়ের আর এক পাশে।

বড় শান্তিতে ছিল গ্রামের মানুষ। ঘন সবুজ প্রান্তরে চরত তাদের ঘোড়া, ভেড়া আর গোরু। দুধ, মাংস, ক্ষীর চালান দিত শহরে। সেই ছিল তাদের জীবিকা। প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির সন্তান মাত্র ক'জন। কটি পরিবার। শহরের সভ্যতার কৃত্রিমতা বাঁচিয়ে নিভৃত নিরালা আলয়ে পরম শান্তির সন্ধান পেয়েছিল তারা।

কিন্তু একদিন...সেদিন ছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না...আকাশ-বাতাস নির্মল আনন্দে আর নীরব হাসিতে যেন উদ্বোল হয়ে উঠেছিল অপরূপ জ্যোৎস্না ধারায়...সেইদিন...হ্যাঁ, সেইদিন গভীর রাতে মহাশূন্য থেকে কালো আগন্তুক নেমে এল উপত্যকার ঠিক মাঝখানে।

না, কোনো শব্দ শোনা যায়নি। ক্ষীণতম গুঞ্জন-ধ্বনিতেও কারো সুপ্তিভঙ্গ ঘটেনি। চারদিকে নিশ্চুপ প্রশান্তির মধ্যে কখন জানি নিবিড় কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছিল, কেউ তা জানতেও পারেনি। কখন যে অপার্থিব আলোর ঝলক শুরু হয়েছিল মসীবর্ণ সেই মেঘপুঞ্জের মধ্যে, কেউ তা সঠিক বলতে পারে না। রোশনাই-রোমাঞ্চিত মেঘবক্ষ ভেদ করে অশনিপাতও ঘটেনি, বজ্রনিনাদে উপত্যকাও নিনাদিত হয়নি। নিঃশব্দে আকাশ ঢেকে গিয়েছিল, জ্যোৎস্না মুছে গিয়েছিল, কীট-পতঙ্গের কণ্ঠরোধ ঘটেছিল, থমথমে স্তব্ধতায় নিথর রজনী আরো শব্দহীন থমথমে হয়ে উঠেছিল।

প্রাকৃতিক প্রশান্তির মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন, প্রাণের গুঞ্জন, প্রাণের শব্দলহরী থাকে। সত্তায় তা মিশে থাকে। তারই নাম প্রশান্ত নীরবতা। কিন্তু সেই ঐক্যের

হেরফের ঘটলেই, সামান্যতম ছন্দপতন ঘটলেই ঘুমন্ত সত্তাও জাগ্রত হয়—কিছুই বোঝা যায় না—অথচ মনে হয়, কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটেছে, কোন সর্বনাশার নিঃশব্দ পদসংকেত যেন অশ্রুত অবস্থাতেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কেও সজাগ করে তুলছে।

সেদিনও ঠিক তাই ঘটেছিল। একজন গ্রামবাসীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। চোখ মেলতেই জানলা দিয়ে দেখেছিল, কালো আকাশ, ঝলকিত তমালকালো মেঘ আর কানে শুনেছিল শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শুধু গোয়ালঘর আর আস্তাবলে, খোঁয়াড়ে আর মুরগির ঘরে, সচকিত প্রাণীগুলির চাঞ্চল্য এবং অকস্মাৎ উচ্চ রবে ডাকাডাকি।

সেই আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গ্রামের প্রত্যেকের। নেকড়ের উৎপাত এখানে নেই, নেই নিশাচর শ্বাপদের আনাগোনা। তবে কেন পোষা পশুগুলোর অকস্মাৎ চাঞ্চল্য, দাপাদাপি, হাঁকডাক? এমন কি ঘরের কুকুর আর বেড়ালগুলোও আচম্বিতে গর্জে উঠেছিল চাপা স্বরে—মানুষের সীমায়িত ইন্দ্রিয়-ক্ষমতায় যা ধরা পড়ে না—ওরা ওদের সেই দূরপ্রসারী ইন্দ্রিয়ক্ষমতা দিয়ে তা যেন টের পেয়েছিল—লাফ দিয়ে উঠে বসেছিল শয্যায়, মানুষের গা ঘেঁষে বসে ল্যাজ গুটিয়ে নিয়ে চাপা গলায় গর্জে উঠেছিল বার বার। ওদের বাকযন্ত্র নেই, কিন্তু শব্দযন্ত্র তো আছে এবং সেই শব্দযন্ত্রে রকমারি শব্দের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারে ভয় আর বেদনা, উল্লাস আর আনন্দ, ক্রোধ আর তৃপ্তি। সেদিন···সেই মুহূর্তে তাদের সম্মিলিত হাঁকডাকের শব্দলহরীতে সম্মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল একটাই ভাব—আতঙ্ক!

বিস্মিত গ্রামবাসীরা দলে-দলে বেরিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে। সবুজ, সুন্দর তৃণভূমিতে জ্যোৎস্নার প্লাবন আর দেখেনি। দেখেছিল শুধু আকাশের কালো মেঘ কোন্ জাদুমন্ত্রবলে পাক খেতে খেতে, টর্নাডোর

ধূলিস্তম্ভের আকারে, নেমে আসছে প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে। হাওয়া নেই, গাছের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না, মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে না—তবুও মেঘরাশি ঘুরছে, পাক খাচ্ছে এবং নামছে।

তারপর সেই ঘুরপাক খাওয়া মেঘের তলদেশ স্পর্শ করেছিল প্রান্তরের মধ্যপ্রদেশ, মোচার মতো, উলটানো শংকুর মতো, মেঘরাশি ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে উঠে গিয়েছিল ঊর্ধ্বাকাশে, অন্ধকারে, ঝলকিত মেঘরাশির আলোয় এইটুকুই কেবল সুস্পষ্ট দেখা গিয়েছিল দূর থেকে।

এরপর যা দেখা গিয়েছিল, তা নেহাতই অস্পষ্টভাবে। অনেকের মনে হয়েছিল, সহসা তন্দ্রাভঙ্গ হওয়ায় হয়তো বা চক্ষুভ্রান্তি, দৃষ্টির ছলনা, দর্শনেন্দ্রিয়ের মরীচিকা-দর্শন। তাই একজনের মতের সঙ্গে আরেকজনের মতের অনৈক্য ঘটেছে, একবাক্যে কেউই বলতে পারেনি সত্যিই সেটা কালো বাক্স ছিল, না, জমাট মেঘপুঞ্জকেই ঐরকম মনে হয়েছিল।

মেঘাবৃত বস্তুটা যদি কালো বাক্সই হয়, তাহলে তা আয়তনে অত বড় কি হতে পারে ? বহুদূর থেকে বাক্সের মতোই মনে হয়েছিল। অবিকল লুডোর ছক্কা যেন। কোণগুলো ঈষৎ গোল—ভোঁতা। কিন্তু একেবারেই নিশ্ছিদ্র। কোনো অপার্থিব আলোক-সংকেত দেখা যায়নি তার গায়ে। কোনোরকম শব্দও শোনা যায়নি। ঘূর্ণ্যমান মেঘস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে তা ধীরগতিতে নেমে এসেছিল মেদিনী লক্ষ করে—তৃণ-প্রান্তরের কিছু ওপরে স্থির হয়ে ভেসেছিল কিছুক্ষণ। তারপর, খুব আস্তে-আস্তে চেপে বসেছিল মাটির ওপর।

চিহ্ন পাওয়া গেছিল পরের দিন প্রাতে। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত বিস্ফারিত-চক্ষু গ্রামবাসীরা অপরিসীম আতঙ্কে দাঁড়িয়ে থেকেছে হিমেল রাতে—ঠকঠক করে কেঁপেছে যুগপৎ ভয়ে এবং ঠাণ্ডায়। ঘূর্ণ্যমান দামাল মেঘস্তম্ভ কিন্তু ঘূর্ণ্যমান দামালই থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর একসময়ে ভোর রাতের দিকে মেঘপুঞ্জ ঘুরতে ঘুরতে, পাক খেতে খেতে, উঠে গিয়েছে ঊর্ধ্বাকাশে—কালোবাক্সের মতো বিরাট সেই রহস্যময় বস্তুটাও নিশ্চয় উঠে গিয়েছে সেইসঙ্গে। কেননা, মেঘরাশি অপসৃত হওয়ার পর, ঊষার কিরণে প্রান্তর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার পর, সোনালি অরুণ-কিরণে তৃণভূমি প্লাবিত হওয়ার পর—বিস্ময়কর আতঙ্কসঞ্চারী দানবিক লুডোর ছক্কাকে আর দেখা যায়নি।

কিন্তু ছাপ রেখে গিয়েছিল অবতরণ ক্ষেত্রে। সুবিশাল একটা বর্গক্ষেত্র দেখা গিয়েছিল সমতল তৃণভূমির ওপর। ঘাস থেঁতলে, চেপটে, দুমড়ে মাটির সঙ্গে মিশে শক্ত পাথরের মতো হয়ে গেছে। ঘাস আর মাটি ঝলসে পুড়ে যেন ঝামা-পাথর হয়ে গিয়েছে। অজস্র রন্ধ্রময় ঝামা-পাথরের মতো শক্ত চ্যাটালো, পেটানো বর্গক্ষেত্র। যেন আগুনের আঁচে আর দুরমুশের পেটাইয়ে রাতারাতি ঈষৎ দেবে-যাওয়া একটা চৌকোনা বর্গক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে সবুজ ঘাস-প্রান্তরে। কিনারার ঘাসগুলোও অল্প-অল্প ঝলসে গিয়েছে। আঁচে হলুদবর্ণ হয়ে গিয়েছে। হাত দিতেই ঝুর-ঝুর করে পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

॥ ২ ॥

বর্গক্ষেত্রটার এক-একদিক প্রায় আধমাইল লম্বা। অর্থাৎ আধমাইল দৈর্ঘ্য প্রস্থ-উচ্চতার একটা ঘনক বা কিউব আকাশ থেকে মেঘবাহিত হয়ে নেমে এসে শূন্যে কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পর আস্তে-আস্তে চেপে বসেছিল ঘাসজমিতে। অবিকল চৌকোনা বর্গক্ষেত্র নয়—কোণগুলো ঈষৎ গোল—ঘনকটির ক্ষেত্রে অনেকেই যা দেখেছে বলে মনে করেছে।

শক্ত, অযুত ছিদ্রযুক্ত পাথরের মতো

জমি, কিন্তু তখনো ঈষৎ উষ্ণ। পাশের জমি শিশিরসিক্ত, ভিজে, হিমেল—কিন্তু বর্গক্ষেত্র তা নয়। গ্রামবাসীরা মূক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল কিছুক্ষণ। তারপর একজন দুঃসাহসী পা বাড়িয়েছিল ভেতরে। কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়েছিল সামনে।

যে দিকে চেয়েছিল, সেইদিকে দৃষ্টি পড়েছিল অন্য সবাইয়ের। দেখেছিল, চৌকোনা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে রাতারাতি আবির্ভূত হয়েছে একটা কুয়ো। পরিষ্কার চৌকোনা একটা কুয়ো। পাড়ে কাটা মাটি পর্যন্ত জমে নেই। নিখুঁত চৌকোনা শুধু একটা পাতাল সুড়ঙ্গ।

দূর থেকে কুয়োর ওপরটাই কেবল দেখা গিয়েছিল। কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখা গেল গর্তটা মানুষের হাতে খোঁড়া কুয়োর চাইতেও বেশ গভীর। অনেক নীচে জল চিকচিক করছে। জলও হতে পারে, কাদাও হতে পারে। অবর্ণনীয় বর্ণের।

অথচ কালকেও মাঠের মাঝে এ গর্ত ছিল না।

কাজকর্ম মাথায় উঠল গ্রামবাসীদের। গোরু-ভেড়া-ঘোড়া মাঠের ওপর চরতে গেল বটে, কিন্তু চৌকোনা জমিটার ওপর কেউ পা বাড়াল না। জান্তব সত্তা দিয়ে যেন তারা বুঝেছে, ও অঞ্চল অন্তত তাদের কাছে নিষিদ্ধ।

সারাদিন গেল জল্পনা-কল্পনায়। কুসংস্কার যাদের অস্থিমজ্জায়, তারা নানাবিধ কাহিনী রচনা করে ফেললে নিশীথ রাতের রহস্য নিয়ে। অপদেবতার কীর্তি নিঃসন্দেহে। এ-অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত করতে এসেছে যখন, তখন সময় থাকতেই সাধের প্রাণ নিয়ে চম্পট দেওয়াই শ্রেয়।

নিছক কুয়ো যে ওটা নয়, যন্ত্র-খনকে কাটা সুগভীর একটা টানেল, এই ধরনের বিজ্ঞানসম্মত কথাবার্তা প্রথম শোনা গেল শহর থেকে ছাত্র আর অধ্যাপকরা আসবার পরে। হুজুগে গ্রামবাসীরা এত বড় একটা খবর শহরে নিয়ে যাওয়ার আগেই শহর থেকে লোক এসে গেল সেইদিনই। এল পাহাড়ের ওপাশের গ্রামের মানুষও। দূর থেকে তারাও গভীর রাতে দেখেছে ঝলকিত মেঘপুঞ্জকে নিঃশব্দে প্রান্তরের মাঝে নেমে আসতে। উল্কাখণ্ড হলে দাউ-দাউ করে জ্বলতে-জ্বলতে চক্ষের নিমেষে মাটিতে আছড়ে পড়ত, মাটি থর-থর করে কেঁপে উঠত। কিন্তু তা তো নয়। সব কিছুই ঘটেছে নিঃশব্দে। টনক নড়েছে কেবল কালো মেঘে সাদা চাঁদের মুখ ঢেকে যাওয়ায়। তাই এসেছিল প্রাকৃতিক রহস্যের অকুস্থলে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে মোটেই প্রাকৃতিক নয়, অপ্রাকৃত—এমন সন্দেহ তখনই অঙ্কুরিত হয়েছিল বিজ্ঞান-জানা কয়েকজনের মধ্যে। তারা এসেছিল পাহাড়ি টাট্টু নিয়ে। দূর গ্রাম আর শহরের সেই চতুষ্পদ জীবগুলি তো নিশীথ রাতের অনৈসর্গিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেনি—তবে কেন উষ্ণ চৌকোনা শক্ত পেটাই জমিটার ওপর পদক্ষেপ করতে চায়নি? পশুসত্তায় কিসের সর্বনাশা ইঙ্গিত রনরনিয়ে উঠছে, তা কেউই আঁচ করতে পারেনি।

কৌতূহলী জ্ঞানতপস্বীরা তৎপর হয়েছিলেন বিবিধ নমুনা সংগ্রহে। পোড়া ঘাস, গুঁড়িয়ে পাউডার-হয়ে-যাওয়া ঘাস, পেটাই মাটি-পাথর, এমনকী দড়িতে বাঁধা বালতি ডুবিয়ে কুয়োর তলদেশ থেকে খানিকটা কাদাও নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাকে কি কাদা বলা যায়? ওপর থেকে চোখ চালিয়ে যা জল-কাদা মনে হয়েছিল, বালতি ভরে, তার খানিকটা তুলে আনবার পর দেখা গেল, জিনিসটা কাদা মোটেই নয়। থলথলে জেলির মতো। থকথকে নরম। সব সময়ে গায়ে গায়ে লেপটে একত্রে থাকার প্রবণতা আছে—কিন্তু আলাদা করে ভিন্ন পাত্রে রাখা যায় অনায়াসেই। অনুসন্ধিৎসুরাও তাই করেছিলেন। চওড়া মুখ কাঁচের বোতলে

খানিকটা নমুনা তুলে নিয়ে বাকিটা কুয়োর মধ্যেই ঢেলে দিয়েছিলেন।

সন্ধে নাবার আগেই ফিরে গিয়েছিলেন যে-যার জায়গায়। কলেজ-ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে নমুনাগুলোকে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আনা হয়েছিল। ফুটন্ত জল থেকে আরম্ভ করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, এমনকি অ্যাকোয়া রেজিয়া পর্যন্ত ঢালা হয়েছিল কাঁচের বিকারে রাখা থলথলে জেলিটার ওপর। কিন্তু অটল, অনড় থেকেছে জেলি। কেবল হিস্-হিস্ শব্দই শোনা গেছে—সমস্ত আক্রমণই প্রতিহত করে অজেয় থেকেছে মহাজাগতিক জেলি।

হ্যাঁ, কলেজের ছেলেরাই জেলিটাকে প্রথম নাম দিয়েছিল মহাজাগতিক জেলি। কসমিক জেলি। মহাশূন্য থেকে তার আবির্ভাব। কিন্তু চৌকোনা গর্তের সৃষ্টি হল কী করে, তার ব্যাখ্যা করতে পারেনি। অজানিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে জেলি মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারে, কিন্তু জ্যামিতিক ছকে অমন নিখুঁত চৌকোনা গর্ত কাটতে পারে কি ? আর ঐ আধমাইল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বর্গক্ষেত্রটা ? মাটি যার পুড়ে বিবর্ণ ও কঠিন হয়ে গিয়েছে ? আকাশ থেকে কালো বাক্সের আবির্ভাবকে তাই অজ্ঞ আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতেও পারা যায়নি।

কলেজ-ল্যাবোরেটরিতে অন্যান্য যে-সব কেমিক্যাল সহজলভ্য, তার সব কিছুরই প্রয়োগ করা হয়েছিল অজ্ঞাত জেলিটার ওপর। অ্যামোনিয়া আর কস্টিক সোডা, অ্যালকোহল আর ইথার, দুর্গন্ধ কার্বন-ডায়-সালফাইড এবং ডজন-ডজন আরো অনেক রি-এজেন্ট। পরিবর্তন শুধু দুটি দেখা গেছে। যতই সময় গেছে, ততই ওজন কমে এসেছে জেলিটার—আয়তনে কমে গিয়েছে। উষ্ণতাও হ্রাস পেয়েছে একটু-একটু করে। আশ্চর্য জেলির মধ্যে চৌম্বক-ধর্মিতাও লক্ষ করা গিয়েছে। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত রহস্যসন্ধানীরা জেলিটাকে বিকারের মধ্যে রেখেই ফিরে গিয়েছেন শয্যাসুখে মগ্ন হতে।

ভোরবেলা ফিরে এসে দেখেছেন আজব কাণ্ড ! কাঁচের বিকার নেই ! জেলিও নেই ! বিকার যেখানে বসানো ছিল, সেই জায়গাটাই কেবল ঝলসে রয়েছে।

কাঁচ অর্থাৎ সিলিকনের প্রতি তাহলে আশ্চর্য এই জেলির আকর্ষণ আছে। শুধু আকর্ষণ নয়, আত্মসাৎ করার প্রবণতা। গোটা বিকারটাকেই গ্রাস করে মিলিয়ে গেছে বাতাসে !

রুদ্ধকক্ষ বীক্ষণাগারে কাঁচের বিকার লোপাট করে আজব জেলি যখন পঞ্চভূতে বিলীন হচ্ছে, সেই রাতেই রহস্য-উপত্যকায় আবির্ভূত হয়েছিল নতুন প্রহেলিকা।

কাঠকয়লার আঁচে, বোর‍্যাক্স বিন্দুতে, এমনকী অক্সি-হাইড্রোজেন ব্লো-পাইপের সুতীব্র অগ্নিশিখাতেই যে-জেলি উদ্বায়ী নয় প্রমাণ করে ছেড়েছে, কিন্তু নিজে থেকেই কাঁচের বিকার আত্মসাৎ করে গ্যাস হয়ে গিয়েছে—নতুন প্রহেলিকার জন্মদাতা অদ্ভুত সেই জেলি কি না সঠিক জানা যায়নি। চৌকোনা গর্তের গভীর আরও কত রহস্য ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কালো বাক্সের মতো অতিকায় মহাকাশযান, আজও তা অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে। চক্ষুভ্রম যে নয়, মেঘপুঞ্জের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি আকর্ষণ করে আলোর লহরী তুলে মহাশূন্যের ব্যোমযানই যে সেদিন সবুজ প্রান্তরে অবতরণ করেছিল, এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই কারো। কিন্তু যার ফোটোগ্রাফিক প্রমাণ নেই, একদল অজ্ঞ গ্রামবাসীর কথায় তাকে স্পেসশিপ বলতেও কেউ চায়নি। তাছাড়া স্পেসশিপ বলতে যা বোঝায়, কালো বাক্সটা তো সেরকম নয়। সুবৃহৎ লুডোর ছক্কা যেন ! নিশ্ছিদ্র, নিরেট, কিন্তু মহাকায়। আস্তে আস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছিল সুবৃহৎ সেই ঘনক—ইঞ্জিনের শব্দ, রকেট-গর্জন কিচ্ছু শোনা যায়নি। নিঃসন্দেহে মাধ্যাকর্ষণ-জয়ের গুপ্ত কৌশল তারা জানে। ভূ-গোলকের প্রচণ্ড আকর্ষণকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পাহাড়প্রমাণ সেই মহাকাশযান তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে নেমেছে। কিন্তু তুলোর মতো

হালকা যে নয়, তার প্রমাণ তো চিঁড়েচ্যাপ্টা ঘাস আর দেবে গিয়ে শক্ত-হয়ে-যাওয়া মাটি। পাহাড়, একটা আস্ত পাহাড় প্রান্তরে অবতীর্ণ হলে ঠিক এই রকমটাই ঘটত। কিন্তু ঘটেছে একটা মসৃণ-গাত্র ঘনকের আবির্ভাবে—ভেতরে তার কী আছে, তা দেখা যায়নি—তবে উন্মত্ত কল্পনা দিয়ে আঁচ করে নেওয়া যায়। হয়তো বিরাট কলকব্জা, মহাকাশ পরিভ্রমণের জটিল, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, এলাহি কাণ্ডকারখানা এবং অদ্ভুত, বিচিত্র মহাকাশচারী।

কিন্তু এই জেলিই কি সেই মহাকাশচারী? আগুনে যাকে পোড়ানো যায় না, অ্যাসিড-অ্যালকালি দিয়ে যাকে টলানো যায় না, কিন্তু নিজে থেকেই গ্যাস হয়ে উবে যায়? রহস্যময় এই জেলিই কি সেই রাতে রহস্য-উপত্যকায় নতুন রহস্যের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল নিশীথ রজনীতে?

দুরু-দুরু বুকে গ্রামবাসীরা দরজায় খিল দিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছিল সেই রাতে। জ্যোৎস্নার ফিনিক অগ্রাহ্য করে, অদৃশ্য অশুভ সর্বনাশার আতঙ্কে কাঠ হয়ে ঠাঁই নিয়েছিল যে-যার ঘরে, না জানি আবার কখন চাঁদের থালা মুখ ঢেকে আবির্ভূত হয় রুদ্র-মেঘ, পুঞ্জ-তমিস্রা আর ভয়াল কালো বাক্স!

কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটেনি। ঘটেছিল ঠিক তার উলটো ব্যাপার। অন্ধকার নয়, আলো। জ্যোৎস্নার ঝকমকে প্রভাকেও ম্লান করে দিয়ে চৌকোনা কুয়োর মধ্যে থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল পর-পর দশ-বারোটা আলোক-স্ফুলিঙ্গ।

গ্রামবাসীরা হলফ করে বলেছে, সেগুলো জোনাকি নয়। ফায়ার-ফ্লাই বা জোনাকির আলো অমন হয় না। তার আলো হয় লালচে অথবা হলদেটে। আলোক-বিতরণের দেহযন্ত্রটি থাকে উদরের তলদেশে—চর্বি-ঠাসা কলাতন্তুর মধ্যে—যে কলাতন্তুর মধ্যে থাকে লুসিফেরিন নামক একরকম পদার্থ; লুসিফেরাজ নামক এনজাইম অর্থাৎ জারকের সংস্পর্শে এলেই বিচ্ছুরিত হয় শীতল, স্নিগ্ধ আলোকধারা।

ঠিক এই এনজাইম আর টিস্যুর অন্বেষণেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আশ্চর্য সেই জোনাকি পোকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলেজ-ল্যাবোরেটরিতে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ তো পরে—মাথার ঠিক নেই আমার। আবার পরের কথা আগে চলে আসছে।

হ্যাঁ, সেগুলো জোনাকি পোকাই বটে। অথবা জোনাকির মতোই দেখতে অতীব আশ্চর্য একরকমের পতঙ্গ—যে পতঙ্গের হদিস আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায়নি। জোনাকিও তো একরকমের গুবরে পোকা—পতঙ্গবিজ্ঞানীদের কাছে 'কোলিওপ্‌তেরা' গুবরেপোকার প্রজাতি, সংখ্যায় প্রায় তিন লক্ষ। কিন্তু তাদের কোনোটির মধ্যেই পড়ে না এই আশ্চর্য অপার্থিব জোনাকি।

দূর থেকে তাদের আলোগুলো কিন্তু স্নিগ্ধ, শীতল মোটেই মনে হয়নি—যেন ফুলঝুরির অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো ঠিকরে-ঠিকরে যাচ্ছে অজানা রঙের অগ্নিকণা। সে যে কী রঙ, তা গ্রামবাসীদের জ্ঞানের বাইরে। নরম, সবুজ আর উজ্জ্বল কমলা রঙ ছড়ানো পাইরোফোরাস জাতীয় জোনাকি এ-অঞ্চলে বিস্তর দেখা যায়। কিন্তু এই জোনাকির আলো সে সব রঙের ধারকাছ দিয়েও যায় না। এ এক অদ্ভুত আলো, বিচিত্র রঙের আলো—এমন এক রঙ যা হাজার রঙে রঙিন আশ্চর্য সুন্দর এই উপত্যকায় কখনো দেখা যায়নি। নিছক আলোক-স্ফুলিঙ্গ যেন তা নয়—আলোক সংকেত। জোনাকিরাও তাদের স্বচ্ছ চামড়ার মধ্যে দিয়ে আলোক-নিশানা পাঠিয়ে আহ্বান জানায় সহচর অথবা সহচরীকে। কিন্তু প্রায় হাজার রকমের এই ধরনের জোনাকি তো সারা পৃথিবীতে

ছড়িয়ে আছে। কারো উদর-কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এ-ধরনের আলোক-সংকেত দেখা যায়নি।

ভিনগ্রহী (!) এই আলো-পোকার প্রতিটি ফ্ল্যাশ যেন বিশেষ অর্থবহ। বিচিত্র প্যাটার্নে জ্বলছে, নিবছে, সংকেত-বার্তা পাঠাচ্ছে। কিন্তু কাকে ? কাকে ? কাকে ?

ফুলঝুরির মতো অগ্নিকণা ছড়িয়ে দশ-বারোটা আলো-পোকা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রান্তরে, প্রান্তর পেরিয়ে পাইন অরণ্যে, ফুলঝোপে ফুলঝোপে। দশ-বারো দিকেই দেখা গেছে দশ-বারো রকমের আলোর প্যাটার্ন।

একটা পোকা উড়ে এসেছিল একজনের ঘরের মধ্যে। লোকটার হাতের কাছেই ছিল একটা খালি টিনের কৌটো, সামান্য পোকা বই তো নয়—দেখাই যাক না কী ধরনের জোনাকি—এই ভেবে খপ্ করে তাকে চেপে ধরে চালান করে দিয়েছিল খালি কৌটোর মধ্যে। মুখ এঁটে দিয়েছিল কৌটোর।

পরের দিন কলেজ থেকে ছাত্র আর অধ্যাপকরা এলে পোকাসুদ্ধ টিনের কৌটো গছিয়ে দিয়েছিল তাঁদের হাতে। যাওয়ার সময়ে তাঁরা আশ্চর্য জেলির আরও একটু নমুনা নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। এবার সিসের বয়েমে।

ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে প্রথমেই আলোক-বিশ্লেষণের পরীক্ষায় তন্ময় হয়েছিলেন। স্পেকট্রোসকোপের সামনে পোকাটাকে আধ ইঞ্চি পুরু প্লেক্সিগ্লাস আধারে পুরে রেখে দেওয়ার পরে ঝকমকে যে আলোক দেখা গিয়েছিল, তা জানা কোনো বর্ণালির রঙের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে জল্পনা-কল্পনাও হয়েছিল পোকাটার উদ্ভট অপটিক্যাল ধর্ম নিয়ে।

পতঙ্গটার কিম্ভূত আকৃতি নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। দেখতে তাকে প্রায় আরশোলার মতো। দুপাশে রুপোলি ডোরা, পিঠটা নীলাভ ধাতুর মতো শক্ত বর্মে ঢাকা, পেটটা মরকত মণির মতো উজ্জ্বল। কিন্তু পুরো দেহটাই স্বচ্ছ। পতঙ্গ-বিজ্ঞানী প্রফেসর বলেছিলেন, অনেকটা এই ধরনের আরশোলা পৃথিবীতে ছিল এক সময়ে, এখন আর তাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তারা তো তেজস্ক্রিয় ছিল না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভিনগ্রহী (!) এই আজব পোকা অতিরিক্ত মাত্রায় রেডিও-অ্যাকটিভ। গাইগার মুলার কাউন্টারে শুধু অ্যালফা, বিটা, গামা রশ্মিই নয়, অন্যান্য আয়োনাইজিং রেডিয়েশনও ধরা পড়েছিল—এমনকী ফোটন বস্তুকণাও !

অনুসন্ধিৎসুরা চমৎকৃত হয়েছিলেন আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ করে। আজব জেলিকে স্পেকট্রোসকোপের সামনে রেখে তাঁর বর্ণালি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। এক অজানা রঙের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল রঙের ব্যাণ্ডে—যে-রঙ দেখা গিয়েছিল উদ্ভট পোকার অদ্ভুত আলোকধারার মধ্যে !

জেলি আর পোকার মধ্যে তাহলে সম্পর্ক একটা রয়েছে। আলোক-সংকেত তাহলে বৃথা নয় !

সেই রাতের মতো উত্তেজনা-চঞ্চল ছাত্র-অধ্যাপকরা বিদায় নিয়েছিলেন পোকাটাকে আধ ইঞ্চি পুরু প্লেক্সিগ্লাসের আধারে, আর জেলিটাকে সিসের আধারে রেখে। পরের দিন সকালে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলেন হতভম্ব হয়ে। সিসের আধার শূন্য। পৃথিবী গ্রহে বন্দিদশায় থাকবার জন্যে আবির্ভূত হয়নি অপরাজেয় স্বাধীন জেলি—তাই উবে গিয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সিসের আধারের মধ্যেই !

আর পোকাটা ? আধইঞ্চি পুরু প্লেক্সিগ্লাস ফুটো করে বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গিয়েছে !

পাছে ভুলে যাই, তাই ঘটনা-পরম্পরা বজায় রাখার জন্যে আতঙ্কসঞ্চারী আর

একটা খবর এই সঙ্গেই জানিয়ে রাখি। খপ্ করে পোকাটাকে ধরে টিনের কৌটোয় যে লোকটি চালান করেছিল, তার হাতে ক্যান্সার হয়ে সে মারা গেছে।

গ্রামের অন্যান্য লোক আর প্রাণীরা কিন্তু কেউ মারা যায়নি। উধাও হয়ে গিয়েছিল একে-একে। তার আগে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটেছিল অনেকগুলো অদ্ভুত ঘটনা। প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াসে তা সংক্ষেপে বিবৃত করে যাচ্ছি।

সব উৎসাহেই এক সময়ে ভাটা পড়ে। সব উত্তেজনাই এক সময়ে থিতিয়ে আসে। রহস্য-উপত্যকার বিবিধ রহস্য নিয়ে মাতামাতিতে একদিন মন্দাভাব দেখা গেল, দিন-কয়েক ছাত্র আর অধ্যাপকরা খুব ছুটোছুটি করেছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত জোনাকিদের আর দেখা যায়নি। এক রাতে দর্শন দিয়েই তারা ফিরে গিয়েছিল চৌকোনা টানেলে—এমনটাই সন্দেহ করেছিলেন সকলে। টানেলের গভীরতায় বালতি ডোবাতেও আর কারো সাহস হয়নি। পোকাটা রেডিও-অ্যাকটিভ, মারাত্মক বিকিরণ কুয়োর তলদেশেও থাকতে পারে। সুতরাং প্রাণ খুইয়ে নিতল কুয়োর অতল ধাঁধা নিয়ে আহাম্মুকি করার সাধ হয়নি কারো। দু-একটা কাগজে হাসি-মশকরা হয়েছিল খবরটা নিয়ে। গল্পবাজ সাংবাদিকরা চনমনে গল্প বানিয়ে কিছুদিন কাগজের কাটতি বাড়িয়েছিলেন। তারপর সব ধামা-চাপা পড়ে যায় এই পৃথিবীর বহু অব্যাখ্যাত রহস্যের মতো। হিমালয়ের অখ্যাত উপত্যকার রহস্যও একদিন বিস্মৃত হয়।

কিন্তু গ্রামবাসীরা দেখে গিয়েছিল পরের পর অনেকগুলো শিহরন-জাগানো কাণ্ড-কারখানা, এসব ব্যাপার কিন্তু আর রাতারাতি ঘটেনি। ঘটেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে।

চৌকোনা বর্গক্ষেত্রের চারপাশের ঘাস তাজাই ছিল প্রথম-প্রথম। তারপর দেখা

গেল, কিনারার ঘাস রাতের অন্ধকারে অদ্ভুত প্রভা বিকিরণ করছে। সেই রঙ। যে রঙ কোনো বর্ণালিতে দেখা যায়নি, যা অদ্ভুত স্বচ্ছ পোকা আর ম্যাগনেটিক জেলির গা থেকে বিচ্ছুরিত বর্ণ-বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছিল স্পেকট্রোসকোপে। রাতের পর রাত এই আশ্চর্য রঙ ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে—ক্রমে ক্রমে ছেয়ে ফেলেছিল সমস্ত তৃণভূমি। তারপর ঘাসপ্রান্তর ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল গাছপালা, ফুলঝোপ, এমনকী পাহাড়ের পাইন বৃক্ষেও। দিনের আলোয় কিছু বোঝা যেত না। রাত হলেই দেখা যেত ক্ষীণ দ্যুতি। ভৌতিক দ্যুতি। আশ্চর্য রঙে ছেয়ে রয়েছে সমস্ত উপত্যকা আর চারপাশের পাহাড়।

শুধু গাছপালা নয়, ঘাসপাতাও যারা খেয়েছে, সেই প্রাণীগুলোকেও রাতের আঁধারে একই রঙ বিচ্ছুরণ করতে দেখা গেছে সর্ব অবয়ব থেকে।

সবশেষে রঙের আবির্ভাব ঘটেছে গ্রামবাসীদের গা থেকেও! প্রত্যেকেরই চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে সেই বিষ-রঙ। হয়তো অদ্ভুত রঙে রোশনাই পশুদের মাংস আহারের ফলেই।

জল খাওয়ার ফলেও হয়তো। কেননা, গাছপালা, মানুষ, পশুর পর বিষ-রঙ প্রবেশ করেছিল পাথরে, জলে, মাটিতে। রক্ত-হিম-করা রঙ বিচ্ছুরিত হয়েছে সব জায়গা থেকেই। এবং ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে শনৈঃ-শনৈঃ গতিতে।

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। একদিন দেখা গেল, একজনের ঘরের সামনে খাড়া একটিমাত্র পাইন গাছের পাশে গজিয়ে উঠেছে আর একটি পাইন গাছ। আগের পাইনটাও বেঁটে হয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস ধরে। গাছটা ছিল বিশেষ আকারের। সোজা নয়। কিছুটা উঠেই বেঁকে গিয়েছিল গুঁড়িটা, পাশে গজানো দ্বিতীয় গাছটাও অবিকল সেইভাবেই কিছুটা উঠেই বেঁকে গেল। লম্বা আর হল না। বামন হয়েই রইল। আগের লম্বা গাছটা আস্তে-আস্তে ঠিক সেই উচ্চতায় পৌঁছে একই বামন

আকার ধারণ করে রইল।

আর প্রতি রাতেই দেখা গেল, সেই রঙের বিচ্ছুরণ। যেন যমজ বৃক্ষ রঙের মাধ্যমে কথা কইছে, নিজেদের মধ্যে। তারও অনেক পরে হুবহু আরো দুটো পাইন বৃক্ষ গজিয়ে উঠল পাশে। মোট চারটে পাইন গাছ। একই-রকম। একই আকার। একই বিকৃতি। একই রঙে রঙিন।

এর পরেই প্রতিটি পরিবার থেকে একটি করে গৃহপালিত পশু উধাও হয়ে গেল। কারো বেড়াল, কারো কুকুর, কারো ভেড়া, কারো ঘোড়া, কারো গোরু। মাসখানেক নিপাত্তা থাকার পর আবার ফিরে এল তারা। কিন্তু জোড়ায়-জোড়ায়। প্রতিটি নিখোঁজ প্রাণীই যেন যমজ হয়ে গিয়েছে। হুবহু একই রকম। গায়ের যেখানে যে ছোপ, শিং যেভাবে বাঁকানো—ঠিক তাই। শুধু সাইজে ছোট। বামন আকার, পাইন গাছের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল। তার ওপরে প্রতিটি যমজের আরও দুটি যমজের আবির্ভাব ঘটল যেন ভৌতিকভাবে।

॥ ৩ ॥

অবিশ্বাস্য এই কাহিনী যার মুখে রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনছিলাম, সে নিজেও উধাও হয়ে গিয়েছিল মাসখানেকের জন্যে। নিজ মুখেই সে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এই একটা মাস কোথায় ছিল, কী ঘটেছে, কিচ্ছু মনে নেই। জানেই না। ফিরে এসেছিল কিন্তু একাই। একদিন হঠাৎ নিশীথে দেখেছিল বিচিত্র রঙে রঙিন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একা। যমজ নয়। একা।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কথাটা মিথ্যে। সে জানে উধাও হয়ে কোথায় গিয়েছিল, কী ঘটেছিল। একা ফিরে এলেও আগের আকৃতিতে সে আসেনি। ফিরে এসেছিল বামন আকার নিয়ে। প্রতিবেশীরা সভয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। শুধু লক্ষ করেছিল, শুধু আকৃতি নয়, প্রকৃতিও তার পালটে গিয়েছে। কারো সঙ্গ ভালবাসে না—একাই থাকে। আকাশের পানে চেয়ে থাকে রাত হলেই। কেউ আর তার ধারে-কাছেও যায়নি। একাই সে আছে সেই থেকে আজও।

কেননা, তারপর থেকেই রহস্যজনকভাবে প্রতিবেশীরা উধাও হয়ে যেতে লাগল একে-একে। একদিনে তা ঘটেনি। তা সত্ত্বেও অভিশপ্ত উপত্যকা ছেড়ে পালিয়ে যেতেও কেউ চায়নি। বিকল হয়ে গিয়েছিল যেন মন আর বুদ্ধি। আশ্চর্য সম্মোহনের আকর্ষণে যেন শেকড়-গাড়া হয়ে গিয়েছিল অভিশপ্ত উপত্যকায়। একে-একে তারা নিখোঁজ হয়েছে। গ্রাম মানব-শূন্য হয়েছে—ঐ একজন ছাড়া—আজও যে প্রহরী এই বিরঙ, বিবর্ণ ন্যাড়া উপত্যকার।

না, আর কোনো ঘাস, কোনো গাছ এখানে গজায় না। সবুজ প্রান্তর, সবুজ পাহাড় এখন ধূসর ধুলোয় ছেয়ে গিয়েছে। এ কাণ্ডটা ঘটেছিল বিশেষ একটা রাতে।

অকস্মাৎ রাতের নৈঃশব্দ্য খান-খান হয়ে গিয়েছিল বজ্রপাতে। ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল আকাশ। কুয়োর সেই অপার্থিব জেলির মধ্যে ম্যাগনেটিক প্রপার্টি আছে আগেই জানা গিয়েছিল—এখন জানা গেল আকাশের বিদ্যুৎকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতাও তার আছে, পর-পর ছ-বার দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে বাজ পড়েছিল উপত্যকায়। প্রত্যেকটাই কিন্তু পুঞ্জিত প্রহেলিকাময় সেই বিবরে—চৌকোনা কুয়োর মধ্যে। লকলকে অগ্নিশিখা মুহুর্মুহু ধেয়ে গিয়েছিল গর্ত লক্ষ করে—প্রবেশ করেছিল ভেতরে।

তারপর সব নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ রঙ-ছাওয়া গাছগুলো হেলে পড়েছিল গর্তের দিকে। পাহাড়, প্রান্তরের প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি উদ্ভিদের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছিল সেই গর্তের দিকে। একই সঙ্গে ভলকে-ভলকে অপার্থিব সেই রঙ—বিদ্যুৎঝলকের মতো, ছুটন্ত

উল্কাপিণ্ডের মতো ধেয়ে গিয়েছিল আকাশপানে—চৌকোনো গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে।

পরক্ষণেই প্রতিটি উদ্ভিদ নিজেদের নিংড়ে উজাড় করে সেই একই রঙ নিক্ষেপ করেছিল গর্তের দিকে, রঙের বন্যা বয়ে গেছিল প্রান্তরে, পাহাড়ে। হু-হু করে রঙের স্রোত ছুটে গিয়ে সেঁধিয়ে গিয়েছিল নিতল গর্তে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল গর্ত থেকে ঠিকরে-যাওয়া অগ্ন্যুৎপাতের মতো রঙের স্রোত—আকাশপানে সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলীর অভিমুখে। দূর আকাশে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গিয়েছিল শেষ রঙের বিন্দু। কালো আকাশের তমিস্রা নেমে এসেছিল উপত্যকায়, প্রান্তরে, পাহাড়ে। কোনো উদ্ভিদেই আর অপার্থিব সেই রঙের বিচ্ছুরণ দেখা যায়নি কোনো রাতেই। মানুষ-পশুর যুক্তি-বুদ্ধি-মন কেড়ে নিয়ে সশরীরে তাদের হরণ করেছিল যারা, তারাই শেষকালে শেকড়-গাড়া প্রাণময় পাদপ-উদ্ভিদেরও প্রাণ হরণ করে নিয়ে গেল এক রাতেই। নিঃশেষে শোষণ করে নিয়ে গেল সমস্ত প্রাণশক্তি।

পরের দিন থেকেই ঘাস, পাতা, গাছপালা শুকিয়ে ঝরে ধুলো হয়ে মিশে যেতে থাকে। যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বিষ-রঙের আক্রমণে। সহস্র রন্ধ্রপথে প্রাণ শোষণ করে নিয়ে যাওয়ার মতো দ্রুত গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গেল প্রতিটি উদ্ভিদ। এমন-কি সেই রাত থেকেই মাটি, পাথর, জলেও আর অপার্থিব রঙের বিচ্ছুরণ দেখা যায়নি। অভিশপ্ত উপত্যকা এখন প্রকৃতই নিথর, নিস্তব্ধ, নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন। চৌকোনা বর্গক্ষেত্রের মাটি-পাথরের উষ্ণতাও অনেক আগেই শীতল হয়ে গিয়েছিল—এই ঘটনার পর থেকে কুয়ো থেকে রঙের বিচ্ছুরণও আর দেখা যায়নি। মহাশ্মশানে অতন্দ্র প্রহরী শুধু এই কাহিনীর বক্তা।

কিন্তু সে কে? মানুষ? মানুষের আধারে ভিন্‌গ্রহী? শীতের জায়গা বলেই আপাদমস্তক সে কাপড়ে মুড়ে রাখে। চাদরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রাখে। কিন্তু একবার... শুধু একবারই চাদর সরে যাওয়ায় তার হাত দেখেছিলাম আমি।

সে হাতের চামড়া স্বচ্ছ। ভেতরের শিরা, উপশিরা, ধমনী, অস্থি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর অদ্ভুত আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে প্রতিটি নখের ডগা থেকে।

কিন্তু তার মুখ? ভাবলেশহীন। অস্বচ্ছ চামড়ায় ঢাকা। শুধু চক্ষুতারকার মধ্যে আশ্চর্য দ্যুতির মধ্যে ভয়াবহ অমানবিকতা—সেই রঙ! অপার্থিব বিষ-রঙ!

তাই তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারিনি। পালিয়ে এসেছিলাম। সে অভয় দিয়েছিল। যেন আমার পালানোর পথ সুগমও করে দিয়েছিল, নইলে ঐ মৃত্যু-উপত্যকা থেকে একলা হেঁটে রাত্রি-নিশীথে লোকালয়ে ফিরতে পারতাম না!

সে চেয়েছিল এই কাহিনী যেন কর্তৃপক্ষের কানে তুলি। এই উপত্যকায় যেন সামরিক পথের নির্মাণ বন্ধ রাখি। আমার অভিনয়, আমার অভিপ্রায় কিছুই অগোচর থাকেনি তার কাছে।

তাহলে সে নিশ্চয় জানে মনে-মনে আমি তার বামন-আকৃতি প্রাপ্তির রহস্যও ভেদ করে ফেলেছি। সব জেনেও সে আমাকে যেতে দিয়েছে। আমার মতামতও কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছোক, নিশ্চয় সেই উদ্দেশ্যেই।

তাই উন্মাদাগারে প্রেরিত হওয়ার আশঙ্কা আছে জেনেও আমার অভিমত লিখে যাচ্ছি।

ক্লোনিং! ক্লোনিং! ক্লোনিং! বিশ্বের বহু দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক আজ ক্লোনিং-বিজ্ঞান নিয়ে পাগল। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে ক্লোনিং একটা দুঃস্বপ্ন, একটা আতঙ্ক, মহাবিপর্যয়ের ভয়াবহ দূত।

'আটলান্টিক' ম্যাগাজিনের একটি প্রবন্ধে জেমস. ওয়াট্‌সন কিন্তু খোলাখুলি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, মানুষ-ক্লোনিং করে ছেলেখেলা করতে যেও না—উত্তেজনার ঝোঁকে বিজ্ঞানের আঙিনায় অনেক. বিপদ এসে পড়বে। জেম্‌স ওয়াট্‌সন হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নন। ডি এন এ-র গঠনে আলোকপাত করে তিনি নোবেল পুরস্কার ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন।

প্রবন্ধটা আমি পড়েছিলাম। সামরিক স্বার্থেই পড়েছিলাম। জেমস ওয়াট্‌সন ক্লোনিং-গবেষণাকে আগুন নিয়ে ছেলেখেলা বলতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য অনেকেই তা মনে করেননি। বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে তাঁরা মানুষ-ক্লোনিংয়ের সুদূর সম্ভাবনা ভেবে দেখেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় জে বি এস হ্যালডেন—কলকাতায় তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্কে আমি আলোচনাও করেছিলাম। ছ' ফুটের ওপর সুদীর্ঘ পুরুষ। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে পুরোপুরি ভারতীয়। জেমস ওয়াট্‌সনের সাবধানবাণী তাঁকে মোটেই বিচলিত করেনি। বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের আমিও কিছুটা বুঝি।"

বলাবাহুল্য বোঝেন। ওরকম ব্রিলিয়াণ্ট সায়েন্টিস্ট পৃথিবীতে কজন আছেন?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "দেশ রক্ষায়, সামরিক প্রস্তুতিতে ক্লোনিং কি ব্যবহার করা সম্ভব?"

উনি বলেছিলেন, "নিশ্চয়। ক্লোনিং-পদ্ধতিতে যে নতুন মানুষ সৃষ্টি হবে, তাদের মধ্যে থাকবে স্পেশ্যাল এফেক্ট।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন, রাতে স্পষ্ট দেখতে পাবে—অন্ধকারেও নজর চলবে। মিলিটারিতে তার প্রয়োজন আছে বৈকি।"

"আর কিছু?"

"কত আর বলব। যন্ত্রণা-অনুভূতি থাকবে না—জখম হয়েও লড়ে যাবে। তারপর ধরুন, অদূর ভবিষ্যতে

আলট্রাসনিক শব্দের অস্ত্রশস্ত্র চালু করেই—কেউ আটকাতে পারবে না। সাধারণ সৈন্য নির্ঘাত ঘায়েল হবে। কিন্তু ক্লোনিং-সৈন্যের ক্ষমতাই থাকবে না আলট্রাসনিক শব্দ শোনার। সবচেয়ে বড় উপকারটা কী হবে জানেন ? অবশ্য সেটা আপনার এক্তিয়ারে পড়ছে না।"

"বলুন না।"

"বামন-মানব তৈরি করা যাবে ক্লোনিং পদ্ধতি দিয়ে।"

"বামন-মানব !"

"হ্যাঁ। গ্রহে-উপগ্রহে অভিযান তো শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন গ্রহেও একদিন যেতে হতে পারে যেখানকার নিদারুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে নড়াচড়ার ক্ষমতাও থাকবে না সাধারণ মানুষ মহাকাশচারীর। কিন্তু বামন-মানব তা পারবে। কলোনি গড়ে তুলবে। কত সুবিধে বলুন তো ?"

হ্যালডেনসাহেবের কথা শুনেই প্রখ্যাত সোভিয়েত-বিজ্ঞানী কে জিওলকোভস্কির ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে গিয়েছিল। অর্ধেক সাইজ মানুষ যে কত উপকারে আসবে, তা তিনি লিখে গিয়েছিলেন "কল অব দ্য কস্‌মস্‌" গ্রন্থে। দেহের সাইজ কমে যাওয়ার ফলে ব্রেনের সাইজও কমে যাবে, ধারণাশক্তি আর অনুভূতিশক্তি হ্রাস পাবে। কিন্তু মেকানিক্যাল কাজ করবে দ্বিগুণ শক্তিতে। সাধারণ মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ বেগে পাহাড় বা সিঁড়ি বেয়ে উঠবে, দৌড়বেও দ্বিগুণ গতিবেগে। সাইজের অনুপাতে সাধারণ উচ্চতার মানুষ যতখানি উঠবে বা দৌড়বে, বামন-মানুষ তার সাইজের অনুপাতে যাবে তার চারগুণ দূরত্বে বা উচ্চতায়। নিজের সাইজের দুজন বামন-মানুষকে অনায়াসে তুলে আছাড় মারতে পারবে পেশীশক্তি বেড়ে যাওয়ায়—ঘাড়ে তুলে নিতে পারবে তারই সাইজের পাঁচজন বামন-মানুষকে। ডবল সাইজের কাঠের গুঁড়ি অনায়াসে টেনে নিয়ে যাবে, নিজের চাইতে দ্বিগুণ ওজনের গাড়ি ঠেলতে পারবে, নিজের যা উচ্চতা তার চারগুণ উচ্চতা থেকে লাফিয়ে পড়বে অনায়াসেই। লাফানোর ক্ষমতাও যাবে বেড়ে। সাধারণ উচ্চতার মানুষ যদি একটা চেয়ার টপকে যায়, বামন-মানুষ টপকে যাবে একটা টেবিল। স্নায়ু যোগাযোগ দ্রুততর হওয়ার ফলে অধিকতর শক্তিশালী তো হবেই, সেই সঙ্গে হবে দারুণ চটপটে, ক্ষিপ্র, প্রাণবন্ত। লাফ-ঝাঁপ, ক্রীড়াকৌশলে তাকে টেক্কা মারা যাবে না। সাধারণ উচ্চতার মানুষ পাথর ছুঁড়বে তার যা উচ্চতা তার দশগুণ দূরে, বামন-মানুষ ছুঁড়বে তার উচ্চতার বিশগুণ দূরে। ঘুসি, লাঠি, তরবারি-চালনা বৃদ্ধি পাবে দ্বিগুণ। সাঁতরাবে অতি সহজে—কেননা দেহের সাইজ তো অর্ধেক—জলের বাধাও পাবে অর্ধেক। এই সব থেকেই জিওলকোভস্কিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মাধ্যাকর্ষণ জয় করতে বামন-মানুষের জুড়ি থাকবে না। তার এনার্জি, প্রাণশক্তি, সবই তো সাধারণ উচ্চতার মানুষের চাইতে বেশি।

শুধু একটা জায়গায় বামন-মানুষ সাধারণ উচ্চতার মানুষের খপ্পরে থেকে যাবে—মানসিক ক্ষমতায়। ব্রেনের সাইজ কম বলেই।

কিন্তু দূর ভবিষ্যতে ক্লোনিং-মানব ধারাবাহিক অমরত্বও লাভ করতে পারে—বলেছিলেন ফরাসি জীববিজ্ঞানী জ্যাঁ রোসট্যাণ্ড। নিজের জীর্ণ নকল দেহ পরিত্যাগ করে আশ্রয় নেবে নতুন নকল দেহে—এইভাবেই চলবে অনন্তকাল।

কিন্তু আত্মা ? আত্মা কি যাবে নকল দেহে ? আমার তা মনে হয়নি। এই একটা ব্যাপার তো মানুষ ক্লোন করতে পারবে না কোনোদিন। টুটেনখামেনের মমিদেহ থেকে ডি এন এ নিয়ে আরেকটা টুটেনখামেন বানানো যেতে পারে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মৃত মানুষদের নকল বানানো যেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না এক নকল দেহ থেকে আরেক নকল দেহে !

তা সত্ত্বেও আরেকজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর জোসুয়া লিডারবার্গ বলেছিলেন, নবীনদের মধ্যে প্রবীণদের জ্ঞান ঝটপট চালান করে দেওয়ার ব্যাপারে ক্লোনিং মির্যাক্‌ল্‌ ঘটাতে পারে।

ক্লোনিং! আজব বিজ্ঞান, ভয়ংকর সম্ভাবনাময় এই বিজ্ঞান আমাকে উতলা করেছিল সেই ১৯৬০ সাল থেকে যখন প্রফেসর এফ সি স্টুয়ার্ড কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে গাজরের কোষ থেকে হুবহু নকল কোষ বানিয়ে অবিকল সেইরকম গাজর সৃষ্টি করেছিলেন। পদ্ধতিটার নাম দেওয়া হয় ক্লোনিং—উৎপাদিত বস্তুটার নামকরণ হয় 'ক্লোন'। গ্রীকশব্দ **Klon** থেকে ক্লোনিং শব্দের উৎপত্তি—যার মানে পল্লব, কলম ইত্যাদি।

আমি কিন্তু সেই থেকেই খবর রাখছিলাম। উদ্ভিদের পরেই প্রাণীকে ক্লোন করা হয়েছিল। দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডক্টর কিঙ এবং ডক্টর ব্রিগস, আর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডক্টর গার্ডন বারংবার আফ্রিকান থাবাওলা ব্যাঙের ক্লোন বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞান-দুনিয়াকে। শেষকালে ১৯৬৮ সালে ক্যালটেক জীববিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট সিন্সহাইমার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—হ্যাঁ, এবার বছর-দশেকের মধ্যে মানুষকেও ক্লোন করা সম্ভব হবে।

আতঙ্ক-ধরানো জল্পনা-কল্পনার শুরু সেই থেকেই। তাহলে তো অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়ক অনন্তকাল নকল বানিয়ে দেশকে রেখে দেবে নিজের মুঠোয়। গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলেও সংরক্ষিত ডি এন এ থেকে বানিয়ে নেওয়া যাবে আরেকটা নকল! হিটলার ফিরে আসবে, চেঙ্গিসখান জাগ্রত হবে, তৈমুরলঙ দেখা দেবে।

শিহরিত হয়েছিল বিজ্ঞানীমহল। জেমস ওয়াট্‌সন নিজেও।

এবং আমি হলাম সেইদিন। শিহরিত কলেবরে শুনে গেলাম কিম্ভূত আকৃতির বামন-বক্তার মুখে অভিশপ্ত-উপত্যকার কাহিনী। সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝলাম, সে নিজেও ক্লোন—আত্মা আর নেই তার মধ্যে। মাসখানেক উধাও হয়ে যাওয়ার পরে ফিরে এসেছে ক্লোন হয়ে—নকল দেহ নিয়ে—বামনাকারে। যারা তাকে বামন-আকার দিয়েছে, নিজেদের সুবিধের কথা ভেবেই করেছে। তার ডি এন এ সংরক্ষিত রেখেছে। অবিকল ঐ চেহারার বামন পৃথিবীর নানান অঞ্চলেও পাঠিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক তাই ঘটেছে। এ-কথা কেন বলছি, তাও বিবৃত করব একটু পরে। অস্থির উত্তেজনায় পরের কথাটা আগে চলে এল আবার, দয়া করে ক্ষমা করবেন।

গত চল্লিশ বছর ধরে কুচক্রী, মহাভয়ংকর, নির্দয়, নিষ্ঠুর এই অমানুষ ভিনগ্রহীরা সুপরিকল্পিতভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। কেউ তা জানে না, কেউ তা আঁচ করতেও পারেনি। শুরু এই মৃত্যু-উপত্যকায়—হিমালয়ের নির্জন অঞ্চলে। ক্লোনিং নিয়ে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করেছে উদ্ভিদের ওপর—সেই পাইন গাছটার যমজ বানিয়ে। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার বানিয়ে। তারপর পরীক্ষা চালিয়েছে গৃহপালিত পশুগুলোর ওপর—তাই কুকুর, বেড়াল, ভেড়া, ঘোড়া, গোরু ফিরে এসেছিল যমজ হয়ে। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হয়ে। এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হওয়ায় সবশেষে ক্লোন করেছে এই কাহিনীর সেই অমানবিক চাহনির বক্তাকে—চল্লিশ বছর ধরে বামন-আকৃতি নিয়ে যে তাদের অবতরণ-ক্ষেত্র আগলে রেখেছে—রাখবেও অনন্তকাল ধরে—জীর্ণ নকলের বদলে আসবে নবীন নকল—সীমায়িত মানসিক শক্তি নিয়ে—সূক্ষ্ম আত্মাহীন বিকট দানবেন্দ্ররূপে!

চৌকোনা বর্গক্ষেত্র উত্তপ্ত ছিল শুধু

একটি কারণে—খুঁড়ে নয়—পুড়িয়ে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল বলে। সেই সুড়ঙ্গ পাতালপ্রবেশ করেই থেমে থাকেনি—ছড়িয়ে পড়েছে ভূত্বকের তলা দিয়ে পৃথিবীর নানান অঞ্চলে। অজস্র সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় সমাকীর্ণ আজ পৃথিবীর পাতাল অঞ্চল। তাই অভিশপ্ত-উপত্যকায় তাদের লীলাখেলা আর দেখা যায়নি। বিশ্বজয় চলছে তলায় তলায়—বামনাকৃতি ক্লোন মানবদের সহায়তায়।

হাস্যকর কল্পনা? অবিশ্বাস্য আষাঢ়ে গল্প? তবে শুনুন কয়েকটি ঘটনা। প্রতিটি ঘটনাই আজও রহস্যাবৃত—প্রহেলিকার প্রলয়-অন্ধকারে আসুন কিঞ্চিৎ আলোক নিক্ষেপ করা যাক।

পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তিশালী 'ক' রাষ্ট্র ক্ষুদ্র 'খ' রাষ্ট্রকে কব্জায় রাখার জন্যে এই হিমালয়ের বুকেই টানেল বানিয়েছিল। এই সেদিন তা ধসে পড়েছে—ধসা টানেলের তলায় সুদীর্ঘ বিবর আবিষ্কৃত হয়েছে। অদ্ভুত বর্ণালি-বহির্ভূত রঙ দেখা গেছে সেখানে। চোদ্দশো সৈন্য নিহত হয়েছে। ঘটনাটা আপনারা জানেন। কিন্তু সামরিক গোপনীয়তার খাতিরে অদ্ভুত রঙের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেননি। আরেকটা পাতাল-সুড়ঙ্গের কথাও প্রকাশ করেননি। রিপোর্টারদের জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর অন্য একটি মহাশক্তিশালী 'গ' রাষ্ট্র ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে টানেলটা—নিছক অন্তর্ঘাতমূলক ব্যাপার।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? জায়গাটা কিন্তু অভিশপ্ত-উপত্যকা থেকে বেশি দূরে নয়। সবচেয়ে বীভৎস খবরটাও আপনারা চেপে গেছেন। চোদ্দশো নিহত সৈন্যের লাশ কি পেয়েছিলেন? যা পেয়েছিলেন, তা শুধু হাড়গোড়। আশ্চর্য অপার্থিব রঙের আভাস তখনো ছিল সেই অস্থিস্তূপে। হাত দিতেই কিন্তু ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

যেমনটি ঘটেছিল এই উপত্যকার একদা প্রাণময় উদ্ভিদ-জগতে। চৌকোনা সুড়ঙ্গে খোঁজ নিলে নিশ্চয় নিখোঁজ গ্রামবাসী আর প্রাণীগুলোর সন্ধানও পাওয়া যাবে—একই অবস্থান। শুধু কিছু ফোঁপরা, ভঙ্গুর হাড়। বুভুক্ষু রঙের আহার্য দরকার—মন, প্রাণ, বুদ্ধি, আত্মা—সবই আত্মসাৎ করে নিয়েছে—সঞ্চিত এবং ক্রমশ বর্ধিত শক্তির দৌলতে গত চল্লিশ বছর ধরে বিস্তৃত হয়ে চলেছে তাদের পাতাল-সাম্রাজ্য।

এবার বলি আরও কয়েকটা ঘটনা। অভিশপ্ত উপত্যকার সঙ্গে এই ঘটনাগুলোর সাদৃশ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না। সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করবেন।

॥ ৪ ॥

সামরিক কাজে আপনারাই আমাকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। একবার নয়, বহুবার। ঘোরাফেরা করতে হয়েছিল উঁচুমহলে—তাই অনেক তথ্য-প্রমাণ চোখে পড়েছিল। না, কোনো সন্দেহই থাকে না তারপর। বাস্তবিকই ভিন্নগ্রহী শক্তি সক্রিয় রয়েছে অবনীতলে এই মুহূর্তে—মহাবিপর্যয়ের পথ সুপ্রশস্ত করে চলেছে অতি সঙ্গোপনে, কেউ তার খবর রাখে না, রেখেও অবিশ্বাসী মনে সর্বনাশা সংবাদকে পাত্তা দেয়নি, নিতান্ত আহাম্মকের মতো নিজেদের অবলুপ্তির পথ সুগম করে চলেছে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু আমি যে খবর পেয়েছি, যে দলিল, ফোটো, সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছি, যাদের মুখে এই ভয়াবহ বিশ্বজয়ের কল্পনাতীত প্রস্তুতিপর্ব শুনেছি—সেইসবের ভিত্তিতে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হলেও কাউকে ব্যক্ত করতে পারিনি হাস্যাস্পদ হবার আশঙ্কায়, পদচ্যুত হবার ভয়ে, চাকরির সুনাম বিঘ্নিত হওয়ার চিন্তায়। তারা এসেছে, তারা রয়েছে, তারা থাকবে। কিন্তু আমরা আর থাকব না। শেষের ভয়ংকর সেদিনের এখনো দেরি আছে—তাই হাতে সময় আছে এখনও

পালটা প্রস্তুতি গ্রহণের— যে-প্রস্তুতির নাম প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি— প্রকৃত প্রতিরক্ষা—মানুষ-ভাইদের বিরুদ্ধে নয়—অমানুষ ভিন্‌গ্রহী শত্রুদের বিরুদ্ধে—যারা এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে—অপার্থিব বিষ-রঙ আর ম্যাগনেটিক অদ্ভুত জেলির আকারে—ক্লোনিং-বিদ্যায় রপ্ত হয়ে যারা এই পৃথিবীর মানবকুলকেই অমানবিক আকার আর প্রকৃতি উপহার দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে তাদেরই সবুজ গ্রহকে বিষ-রঙে ছেয়ে দিতে। তারপর হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন এই পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্ত জীবের প্রাণ শোষণ করে নিয়ে, মেদ-মজ্জা-মাংস-অস্থি আত্মসাৎ করে নিয়ে শুধু জীর্ণ, ফোঁপরা রেণু-রেণু কাঠামোর ওপর বিজয়গৌরবে উৎকট উল্লাসে তাথৈ-তাথৈ নেচে চলবে অপার্থিব সেই বিষ-রঙ—মহাশূন্য থেকে দেখা যাবে সবুজ পৃথিবী আর সবুজ নেই—সর্বগ্রাসী বর্ণালি-বহির্ভূত বিষ-রঙে রঙিন এক নতুন বিষাক্ত পৃথিবী !

না, না, শেষের সেই ভয়ংকর দিনটার কল্পনা আবার আমার লেখনীকে কাঁপিয়ে তুলছে, আবার আমার যুক্তি-বুদ্ধি-মন-আত্মাকে শিহরিত করে তুলেছে, উপসংহারের মধ্যে আবিলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাই এই শেষটুকু উন্মাদের প্রলাপোক্তি হয়ে যাওয়ার আগেই আমেরিকায় যা দেখেছিলাম, যা শুনেছিলাম, তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে রাখি। টপ সিক্রেট জেনে এসেছিলাম। টপ সিক্রেটই নিবেদন করে যাচ্ছি। টপ সিক্রেটই থাকবে এই প্রতিবেদন—এইটুকুই শুধু আবেদন আপনাদের কাছে।

মহাবিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটবে কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়রূপে—তেমনটা মনে হয়েছিল এই অভিশপ্ত উপত্যকায়। মনে হবে তাই। বুকের পাটা নিয়ে অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আড়ালে রয়েছে অপ্রাকৃত কারণ, মানুষ তো নিজেকে মহাজ্ঞানী বলে মনে করে। অনেক শোচনীয় বিপর্যয়কে কিন্তু আজও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে উঠতে পারেনি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কখন ঘটবে, তাও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। ভূমিকম্প ধরবার সিস্‌মোগ্রাফ আমাদের আছে, ওয়েদার স্যাটেলাইট থেকে ফোটো তুলে বলে দিতে পারি মারাত্মক মেঘপুঞ্জ ঘনীভূত হচ্ছে কোথায় কোথায়। হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পরেও কিন্তু আমরা নিতান্তই অসহায়, ভূমিকম্প ঠিক কখন তার আঘাত হানবে, কোথায় দেখা দেবে, কতখানি প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করবে—তা কিন্তু বলতে পারি না। বন্যার তাণ্ডবলীলাও অতর্কিতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি, প্রস্তুতিপর্বকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে মারণ-যজ্ঞ চালিয়ে যায় দেশে দেশে। এই তো আমাদের ক্ষমতা ! তবুও আমাদের দর্পের সীমা নেই, অহংকারের শেষ নেই। কোথাও পাহাড় ধসে পড়ছে, কোথাও মাটি বসে যাচ্ছে। বিস্মিত হই। কিন্তু উৎস-সন্ধানে অপারগই থেকে যাই। বলতে পারেন, আজও মানুষ কেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় নির্ণয়ে এত অক্ষম, এত অসহায়, এত অজ্ঞ ? কারণ, বহু ক্ষেত্রেই এসব আদৌ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই নয়—মূলে রয়েছে অন্য জগতের কারসাজি।

ভূত্বকের কম্পন থেকেই ভূমিকম্প, পাহাড় ধসে যাওয়া, মাটি বসে যাওয়ার উৎপত্তি। শক্‌-টা যদি সমুদ্রে আবির্ভূত হয়, তাহলেই প্রচণ্ড বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়লীলা দেখি। অন্ধ্রের উপকূলে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা নিশ্চয় এখনো বিস্মৃত হননি। জলের উপর আগুন-বলের নৃত্য প্রত্যক্ষ করেছিল বহুজনে—সংবাদপত্রের সেই কাহিনী বিস্মিত করেছিল অনেককেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অব্যাখ্যাতই থেকে গেছে। উল্লোল অগ্নিগোলকের নৃত্য-রহস্য রহস্যই থেকে গিয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগে টেক্সাসের হিউসটনে একটা বিপর্যয়ের পরে পর পর অনেকগুলো অদ্ভুত আবিষ্কারে টনক নড়েছিল কর্তৃপক্ষের। প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল সন্দেহাতীতভাবে যে, ভিন্‌গ্রহী শক্তিসমূহ এই মুহূর্তে তৎপর রয়েছে আমাদের এই গ্রহে, এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছে যাতে বিপর্যয়গুলোকে অস্বাভাবিক বলে মনেই হবে না।

রানিগঞ্জ শহর বসে যাচ্ছে, কলকাতা দেবে যাচ্ছে, লণ্ডন শহরের অবস্থাও তাই। সবই ঘটনা। অলীক কল্পনা নয়। কিন্তু কেন? ভূতত্ত্ববিদ্‌রা হাজার ব্যাখ্যা হাজির করছেন। কিন্তু বিপর্যয় রোধের কোনো সমাধান হাজির করছেন কি?

হিউসটনের সদ্যনির্মিত অফিস-বিল্ডিংটি নিয়ে শহরবাসীদের গর্বের অন্ত ছিল না। অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নতুন অতি-মজবুত নির্মাণ-উপকরণ সবাইকেই নিশ্চিন্ত করে তুলেছিল বলেই নতুন-নতুন কোম্পানিরা চোখ-ঝলসানো অফিস বসিয়েছিল বাড়িটায়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি কী ঘটতে চলেছে।

ধুমধাম করে আনুষ্ঠানিকভাবে অট্টালিকার উদ্বোধন-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার দ্বিতীয় দিবসে ঘটল কাণ্ডটা। লোকজন তখন গিজগিজ করছে অফিসে অফিসে। ওপরতলার অফিসের মানুষগুলো হঠাৎ শিউরে উঠল পায়ের তলার মেঝে কাঁপছে দেখে। প্রথমে অল্প, তারপরেই থর-থর কাঁপুনি। মেঝে রীতিমত দুলছে। প্যানিক দেখা দিল অফিসে অফিসে। রহস্যময় কম্পন অফিসসুদ্ধ লোককে তাড়িয়ে নিয়ে গেল লিফটের দিকে। গাদাগাদিতে লিফট ছিঁড়ে পড়ে আর কি! বিল্ডিং সিকিউরিটিকে সজাগ করা হল তৎক্ষণাৎ। নীচের তলার লোকরা শুনল আর্তনাদ আর দুপদাপ পদশব্দ, হুইসল্ আর ইণ্টার-কমে ঘোষণা।

লিখছি, আর গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। কেননা, এই ঘটনার পর থেকেই পায়ের তলার মেঝে ঈষৎ কেঁপে উঠলেও শিউরে উঠি। ইচ্ছে যায়, ছুটে গিয়ে খোঁজ নিই বাড়ি অথবা অফিসের তলায় ভিন্‌গ্রহীদের কোনো গোপন টানেল রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে কি না।

হিউসটনে সেদিন আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি খালি হয়ে গেল। এসে গেল সরকারি বৈজ্ঞানিকরা। শুরু হল্ শক্-বিশ্লেষণ পর্ব। বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বললেন, সর্বনাশ! এ ইমারত তো এখুনি ধসে পড়বে!

অট্টালিকা ঘিরে পুলিশ—কাউকে ঢুকতে দেওয়া হল না গণ্ডির মধ্যে। যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হল অন্য দিকে। বাড়ি ধসে পড়ল তারপরেই।

আচম্বিতে যেন জমির মধ্যে 'বিস্ফোরণ' ঘটল। থরথর করে শিউরে উঠল মেদিনীবক্ষ। স্পষ্ট দেখা গেল, পেল্লায় মজবুত বাড়িটা দুলছে—খুব অল্প। চোখের ভুল যে নয়, তা প্রমাণিত হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। বীভৎস দৃশ্য! একজন প্রত্যক্ষদর্শী নিজ মুখে বলেছিলেন আমাকে, "পুরো বাড়িটা এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন দানবিক টিউনিং-ফর্ক চালু রয়েছে।" টিউনিং-ফর্ক হল দু-দাঁতওলা ইস্পাতের যন্ত্রবিশেষ—যা দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের সুর মেলানো হয়।

একইসঙ্গে শোনা গেল একটা ঘোর চাপা গুরগুর শব্দ। বাতাস শিউরে-শিউরে উঠল সেই অদ্ভুত চাপা গুরুগুরু আওয়াজে।

পরক্ষণেই মাটির মধ্যে বসে গেল বিশাল ইমারতটা। যেন মাখনের মধ্যে। ধাতু আর ভাঙা কাঁচ, টুকরো-টাকরা প্লাস্টিক আর ফার্নিচার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল রাস্তায়।

হতভম্ব সন্ধানী দল স্থিতধী হওয়ার পর আশপাশের জমিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখল ওপর থেকে নিরেট ভূমি মনে হলেও পুরো তল্লাটটা ফোঁপরা হয়ে রয়েছে। পাতাল

জুড়ে মাইলের পর মাইল ফোঁপরা ফোকর। "যেন কয়েকশো বছর ধরে অতিকায় পিপীলিকারা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে গেছে। এরকম দৃশ্য জীবনে দেখিনি,"—বলেছিলেন জনৈক বিজ্ঞানী।

স্থানীয় একটি পত্রিকার দুঃসাহসী এক সাংবাদিক গরম-গরম খবর জুগিয়ে পাঠকদের চনমনে করে তোলার ব্যাপারে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের তলদেশেও নাকি বিস্তর সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা আবিষ্কৃত হয়েছে—এই ধরনের একটা খবর ছাপিয়ে রাতারাতি নাম কিনেছিল সাংবাদিকমহাশয়। হিউসটনের অত্যাশ্চর্য ঘটনায় চুল খাড়া করে সে দৌড়েছিল ডালাস কেস যারা তদন্ত করেছিল, তাদের কাছে। তুখোড় ডিটেকটিভ তারা। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিল, একই দুর্যোগ কি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়েও ঘনিয়ে আসছে ? একদা যা ছিল পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা, যা কিনা নিউইয়র্ক শহরের শ্লাঘার বস্তু, তাও কি অবশেষে পৃথ্বী-গহ্বরে প্রবেশ করবে ?

না। সেরকম কোনো বিপদাশঙ্কা নেই অন্তত এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে—জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞমহাশয়। কেননা, ম্যানহাটান আয়ল্যাণ্ড তো রয়েছে অত্যন্ত নিরেট, কঠিন, আগ্নেয়পাথরের ওপর। বেশির ভাগই গ্র্যানাইট আর শিস্ট —স্তরে স্তরে বিনাস্ত শিলাবিশেষ। যত টানেলই খোঁড়া হোক না কেন, ধকল সইতে পারবে।

কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটির মতো সৌভাগ্য তো সব শহরের নেই। যে সব শহর খনি ঘিরে গড়ে উঠেছে তাদের কপালে কী দুর্গতি নাচছে তা কে বলতে পারে ? এই ব্যাপারটিতে বিলক্ষণ সন্দিহান দেখা গিয়েছিল বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে, কিন্তু ক্রমাগত যদি পথঘাট বাড়ি ঘরদোরের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ নির্মিত হতে থাকে, সুড়ঙ্গ আর শাখা-সুড়ঙ্গর গোলকধাঁধার পাতাল প্রদেশ যদি ফোঁপরা হয়ে যায়, তাহলে কি ভূস্তরে ফাটল ধরবে না ? সে ফাটল ওপর থেকে দেখা না গেলেও তলায় তলায় থাকবে। তারপর একদিন আসবে যখন ওপরকার চাপ আর সইতে পারবে না। বাড়ি পাহাড়, ব্রিজ—সবই একদিন মাটিতে ঢুকে যাবে।

প্রতিক্রিয়াটা হবে ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়ার মতো মারাত্মক। ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্রে তা ধরা পড়বে ভূমিকম্প হিসেবেই। জমি বরাবর কম্পন এগিয়ে যাবে বহুদূর। কে জানে, ছোটখাটো যেসব ভূকম্প ধরা পড়ছে যন্ত্রে, সেগুলো বহু দূরের বহুবিস্তৃত পাতাল-সুড়ঙ্গের ধসে যাওয়ার ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে কি না ?

হিউসটনের ক্ষেত্রেও তো এমনটি ঘটতে পারে ? সন্দেহটাকে সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করে নিলেন বিশেষজ্ঞমশায়। সংখ্যা - তথ্যের সংগ্রহ আর শ্রেণীবিভাগ যোগাড় করলেন, অন্যান্য যেসব ব্রিজ, বাড়ি-কাঠামো ধসে পড়েছে তাদের চারপাশের জমির নকশা আনালেন। দেখেশুনে ধাত ছেড়ে গেল ভদ্রলোকের। ঘুমের বড়ি খেয়েও আর রাত্রে ঘুমোতে পারেননি।

পেলেন অকাট্য সাক্ষ্য, প্রমাণ, তথ্য। হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর তলায় বিরাজ করছে বিশাল সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা, গলিপথের পর গলিপথ, অজস্র অসংখ্য !

রক্ত-হিম-করা এহেন আবিষ্কারের পর আর তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো যায় না। শুরু হল জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে জোর তদন্ত। যেসব বাড়ি ধসে পড়েছে, সেই সব জায়গায়। প্রতিধ্বনি শব্দের সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা করা হল। কয়েক ক্ষেত্রে ডিনামাইট বিস্ফোরণের কথাও ভাবা হয়েছিল—কিন্তু বিস্ফোরণের ধাক্কায় দুর্বল ভূস্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধসে যেতে পারে—এই ভয়ে শিকেয় তুলে রাখা হল প্রস্তাবটা।

বিস্ফোরণ-প্রস্তাব বাতিল হল। বাতিল হল সোনিক ওয়েভের পরিকল্পনাও—শব্দ-তরঙ্গের ধাক্কাও কি সইতে পারবে ঝাঁঝরা ভূত্বক ? যন্ত্রপাতি দিয়ে তদন্ত করা তাহলে তো অতিশয় বিপজ্জনক ব্যাপার। সশরীরে দেখে আসতে হবে কী কাণ্ড চলছে তলায়। নকশা এঁকে আনতে হবে সুড়ঙ্গের।

কিন্তু কে নামবে ? লোক কোথায় ? বিপজ্জনক গুহায় নেমে নকশা আঁকা এমন কী ব্যাপার। গলতি থাকলে আঞ্চলিক ভূতত্ত্বে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বলে ও কাজে নামতে কারো অনাগ্রহ নেই। কিন্তু জেনেশুনে রক্ত-জমানো ঐ টানেল পরিদর্শনে যেতে কেউ তো রাজি নয়। হাজার টাকা দিলেও নয়।

শেষকালে তলব পড়ল খনি-শ্রমিকদের। বদ্ধ পাতালে থাকতে তারা অভ্যস্ত, পাথুরে স্তরের দুর্বলতা ধরতে পারে, কোন্ জায়গায় ধস নামবে—তার পূর্বলক্ষণের সঙ্গে পরিচয় আছে, বিষাক্ত গ্যাস নাকে এলেও টের পায়।

প্রত্যেককেই জানিয়ে দেওয়া হল বিষয়টা কিন্তু 'টপ-সিক্রেট'। কারো সঙ্গে এ-নিয়ে গুজগুজ ফিসফাস করাও চলবে না। কাজ শেষ হওয়ার আগেই এদের অনেকেই কিন্তু মনেপ্রাণে চেয়েছিল, হিউসটন টানেলের অভিজ্ঞতা যেন স্মৃতিপট থেকে মুছে যায় চিরতরে !

বিশেষ এই গুপ্ত অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রোজেক্ট মোল'। প্রথমদিকে সামান্য খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়েছিল বটে, তারপরেই পাওয়া গেল মৌচাকের মতো পাতাল সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথ।

নটা দল নেমেছিল সবচেয়ে বড় দুটো সুড়ঙ্গে। প্রত্যেক দলে ছিল তিনজন। প্রত্যেকের কাছে ছিল তাজা ব্যাটারি-লাগানো ট্রান্সিভার। প্রত্যেকের ওপর নির্দেশ ছিল দলছাড়া না হওয়ার—কোনো পরিস্থিতিতেই কেউ যেন একলা বাহাদুরি দেখাতে না যায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছিল রোমাঞ্চকর পাতাল-অভিযান। রেডিওতে ভেসে এসেছিল একজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—"...দরজার মতো কী যেন দেখছি...খোদাই-করা নকশা আর ছবি আঁকা অদ্ভুত দরজা.. !"

কোন্ জায়গায় দেখা গেছে বিচিত্র কপাট, জেনে নেওয়ার পরে বিশেষ একটা দল ফোটো তোলার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়েছিল সেখানে।

ফোটোগুলো এখনো আছে। অতি সংগোপনে রাখা আছে। আমার দেখার সুযোগ অথবা দুর্ভাগ্য হয়েছে। যেন মসৃণ ধাতু দিয়ে তৈরি পাল্লা। এমনই দুর্ভেদ্য যে আধুনিক যাবতীয় সরঞ্জাম দিয়ে পাল্লায় একটা ছিদ্র সৃষ্টিও করা যায়নি। অবিশ্বাস্য রকমের শক্ত এই ধাতুতেই কিন্তু উৎকীর্ণ রয়েছে জটিল নকশা। কাদের কাজ ? তারা এই ধাতু খোদাই করল কী করে ? নকশা দেখে মনে হয়েছিল যেন আশপাশের সুড়ঙ্গের একটা মানচিত্র। নিঃসন্দেহে ঐ দরজার আড়ালে এমন কিছু আছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৌড়ে এলেন বিজ্ঞানীরা, সেই সঙ্গে সরকারি অফিসাররা।

কৌতূহলে ফেটে পড়ে বিজ্ঞানীরা ছুটে এসেছিলেন দরজার উৎকীর্ণ প্যাটার্নগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে। না জানি হারিয়ে-যাওয়া কোন্ হরফের সন্ধান পাওয়া গেল অবশেষে। কিন্তু নকশা দেখে তাবড়-তাবড় বৈজ্ঞানিকের মাথা যখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, তখন দরজা খোলার সংকেত আবিষ্কার করে ফেলল সাধারণ একজন খনি-শ্রমিক। বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে সে জানে না, ছোট-ছোট ব্যাপারেই চোখ চলে ভাল। তাই অকস্মাৎ তার খেয়াল হল, আরে, জবড়জঙ নকশার এক জায়গায় হুবহু এইরকম দেখতে আর একখানা দরজার ছবি আঁকা রয়েছে যেন ! শুধু তাই নয়, ছবিতে দেখানো হয়েছে

দরজাটা যেন খুলে যাচ্ছে।

চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল অজ্ঞ খনি-শ্রমিক। তাই দেখলে আরো কয়েকটা অদ্ভুত চিহ্ন। খুলে যাওয়া কপাটের ছবিতে কয়েকটা জায়গা যেন একটু বেশি রকমের গাঢ় রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা। মাত্র কয়েকটা পয়েন্ট! আর কিছু না।

দুই সঙ্গীকে তখুনি ডেকে দেখাল বিমূঢ় খনি-শ্রমিক। মোটা মাথা খাটিয়ে ভেবে দেখলে, নকশার গায়ে ঠিক ঐরকম পয়েন্টও তো রয়েছে। টিপেই দেখা যাক না পয়েন্ট কটা।

তিন-দুগুণে ছটা হাতে সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিল সব কটা পয়েন্টে—একসঙ্গে।

অবাক কাণ্ড! নিঃশব্দে...আস্তে আস্তে...ভেতর দিকে ঘুরে গেল বিশাল ধাতব দরজা।

দেখা গেল একটা ঘর।

খনি-শ্রমিক বলেই ধাত খুব শক্ত। তাই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়নি। কিন্তু তিন-তিনটে কণ্ঠের বিকট ভয়ার্ত আর্তনাদ রেডিও মারফত বাকি আটটা দলের কাছে পৌঁছতেই নক্ষত্রবেগে দৌড়ে এসেছিল তারা।

এসে যা দেখেছিল, তারও ফোটোগ্রাফ আমি দেখেছি। বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি দেখেছি। কোথায় দেখেছি, কার কাছে দেখেছি, তাও বলব যদি আমাকে পাগলা-গারদে পাঠানোর চিন্তাটা মন থেকে তাড়ান।

অদ্ভুত কতকগুলো বস্তু ছিল ঘরের মধ্যে। একটা ধাতুর টেবিল—কিন্তু পৃথিবীর মানুষ টেবিল বলতে যে আকৃতি কল্পনা করে নেয়—সে-রকমটা নয়। এর ডিজাইনই অপার্থিব। পাঁচটা পা। টেবিলের ওপর রয়েছে একটা হিউসটন টেলিফোন ডিরেক্টরি, কিছু পেরেক, নাট-বল্টু, একটা বহুতল অট্টালিকার আংশিক নকশা, একটা খালি টিফিনের বাক্স, আধ-খাওয়া একটা চিকেন স্যাণ্ডউইচ, একটা চুরমার-হওয়া থার্মোফ্লাস্ক।

কপাট খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রকৃতিস্থের মতো বিকট গলায় বারংবার আর্তনাদ করে উঠেছিল খনি-শ্রমিকরা, কিন্তু অন্য একটি দৃশ্য দেখে। সে-দৃশ্য এমনই বীভৎস যে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাসযোগ্য নয় কোনোমতেই। কিন্তু সে ফোটোও আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, আমি দেখেছি!

ঘরের পেছনদিকে স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে শুধু কংকাল আর কংকাল। দ্বিপদ মানুষের কংকাল, চতুষ্পদ প্রাণীর কংকাল। কিন্তু কোনো কংকালই সাদা নয়, স্বাভাবিক হাড়ের রঙের নয়। অপার্থিব এমন একটা রঙে রাঙানো যে-রঙের অস্তিত্ব বর্ণালিতে ধরা পড়েনি।

হ্যাঁ, সেই রঙ! যে রঙ মহাকাশ থেকে রাত্রি-নিশীথে মর্তে অবতীর্ণ হয়ে নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে অভিশপ্ত উপত্যকার সমস্ত রঙ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন!

হিউসটনের পাতালকক্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শুধু হাড়ই আছে—মাংসের অস্তিত্ব একদম নেই। এবং সে হাড় লক্ষ রন্ধ্রযুক্ত, বিলকুল ঝাঁঝরা—হাত দিতেই ঝুর-ঝুর করে গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গিয়েছে।

স্তম্ভিত সন্ধানী দলের তখন টনক নড়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বহু ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই কংকাল থেকে তাদের শনাক্ত করাও তো মুশকিল—হাত দিলেই যে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

টিফিন বাক্স, থার্মোফ্লাস্ক, বাড়ির নকশা, টেলিফোন ডিরেক্টরির হদিস অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল। ধসে-যাওয়া ইমারতটি নির্মিত হওয়ার সময়েই ইঞ্জিনিয়ারদের টেবিল থেকে চুরি গিয়েছিল অনেকদিন আগে। কৌতূহলবশেই বোধহয় চক্ষুদান করেছিল তস্কর মহাশয়রা। কিন্তু মনে না ধরায় ফেলে গিয়েছে ঐভাবে। থার্মোফ্লাস্ক অধীরভাবে খুলতে গিয়ে ভেঙেও ফেলেছে। ভাঙা

কাঁচে প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছে। তলানি কফির সঙ্গে অস্বাভাবিক একটা বস্তুও মিশে থাকতে দেখা গিয়েছে।

ভয়াবহ বস্তু ! আজও তার বৃত্তান্ত মনে এলে রক্ত ছলকে ওঠে আমার।

অজ্ঞাত বস্তুটাকে তৎক্ষণাৎ পাচার করা হয়েছিল ল্যাবোরেটরিতে। চুটিয়ে বিশ্লেষণ চালানোর পর প্রাথমিক পর্যায়ে জিনিসটাকে জৈব বস্তু বলে ধরা গিয়েছিল। কী-কী উপকরণ আছে তার মধ্যে, উৎসই বা কোথায়—জানার জন্যে অপার্থিব বস্তুটাকে আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপযুক্ত সরকারি গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছিল তড়িঘড়ি।

বিশেষ এই বিশ্লেষণের রিপোর্ট কিন্তু কাউকে দেখতে দেওয়া হয়নি। আমি অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম, 'প্রোজেক্ট মোল'-এর এক খনি-শ্রমিককে খুঁজেপেতে বার করেছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জেনেছিলাম তা এই

"বলতে পারব না—নিষেধ আছে। জিজ্ঞেস করবেন না। যা দেখেছি সেখানে, তার কিছুই কাউকে শোনাতে পারব না—প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যেটুকু বললাম, তাও যদি পাঁচকান হয়, জানবেন কপালে অনেক দুর্গতি আছে। জিনিসটা যে কী সে-বিষয়ে কারো আর কোনো সন্দেহ নেই। রক্ত ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মশাই, রক্ত ! কিন্তু কিসের রক্ত, কার রক্ত, সেটাই তো কেউ ধরতে পারছে না।"

হ্যাঁ, আজও সেই অজ্ঞাত রক্তের উপাদান রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে এই ধরনের রক্ত কোনো জীবের আছে বলে জীব-বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তাই 'প্রোজেক্ট মোল'-এর প্রত্যেকেই বিষয়টা ভুলে যেতে চায়, কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না—অথবা জানলেও বোবা সেজে থাকে।

আমার কৌতূহল কিন্তু তুঙ্গে পৌঁছেছিল। আমার সামরিক পদমর্যাদাই তত্ত্বতল্লাশের পথ সুগম করে দিয়েছিল। সরকারি মহলের কানাকানি থেকে জানতে পেরেছিলাম, হিউসটন টানেল নির্মাণ করেছে যারা, আজও যারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সেখানে তারা খুবই বুদ্ধিমান জীব—কিন্তু মানুষ নয়। এরকম এলাহি কাণ্ড মানুষের সাধ্যাতীত। টানেলগুলো মোটেই খোঁড়া হয়নি—মাটি পুড়িয়ে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিরেট পাথরে এরকম নিখুঁত সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা সৃষ্টি খনি-বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের বাইরে—কল্পনারও বাইরে। মাখনের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেওয়ার মতোই নিরেট পাথর কেটে গলি বানিয়ে নেওয়া হয়েছে—মাটি কাঁপেনি। মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়—একেবারেই নয়।

মানুষের কাজ যে নয়, তার প্রমাণ তো ঐ রক্ত। অমানবিক, অজ্ঞাত, অপার্থিব !

হিউসটন টানেলের মতো অন্য টানেলের সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন সন্ধানীরা। পুড়িয়ে টানেল বানালে মাটিতে উত্তাপ অনুভূত হবে নিশ্চয়। এই সূত্র ধরে গোয়েন্দারা একটা লণ্ড্রি কারখানার পাতাল ঘরে বয়লারের পাশে গুঁড়ো কয়লার গাদায় অদ্ভুত কতকগুলো পদচিহ্ন দেখেছিলেন। ছোট ছেলের পায়ের ছাপ। কিন্তু পা টেনে-টেনে চলার ধরন দেখে বোঝা গিয়েছিল আলো তাদের চোখে সয় না। অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে যেন স্বস্তি পেয়েছে। সুড়ঙ্গটা পাওয়া গেছে বয়লারের তলায়।

ছোট ছেলের পায়ের ছাপ ! তাই কি ? আমি তো বলব বামন-মানবের পায়ের ছাপ। ক্লোন-মানুষের পায়ের ছাপ। তাদের কেউ কোনোদিন দেখেনি। যদি দেখতে পায়, ফোটো তুলে রাখে, আমি হলফ করে বলতে পারি—অভিশপ্ত উপত্যকার এই কিম্ভূত বামন-মানবের মুখ-চোখ-চেহারার সঙ্গে তা আগাগোড়া মিলে যাবে। একই ছাপ থেকে অনেক সন্দেশ বানালে যা হয়—এও যে তাই। একই বিকৃতকোষ থেকে বহু কোষ বানিয়ে নেওয়া বিকৃত অমানুষ। বামন-আকার দেওয়া হয়েছে

অনেক কারণে। তার একটা হল টানেল নির্মাণের এবং টানেল পরিক্রমায় সুবিধের জন্যে।

হিউসটন সন্ধানীরা কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন। পুড়িয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই জমি গরম হয়ে যায়। অভিশপ্ত উপত্যকাতেও চৌকোনা বর্গক্ষেত্র গরম হয়ে গিয়েছিল এক রাতেই—দীর্ঘদিন লেগেছে শীতল হতে—হিমালয়ের কনকনে ঠাণ্ডাতেও!

আধা-সাইজের মানবরা মানসিক ক্ষেত্রে পেছিয়ে থাকবে—এই ছিল জিওলকোভস্কির ভবিষ্যদ্বাণী। হিউসটন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, অপার্থিব রক্ত যাদের তারা নাকি বুদ্ধিমান জীব।

নতুন করে তাই জিওলকোভস্কি পড়তে বসেছিলাম। হেঁয়ালির সমাধান পেয়ে গেলাম। এক জায়গায় তিনি পরিষ্কার লিখে গেছেন, মস্তিষ্ক আয়তনে কমে গেলেও মস্তিষ্কের গঠন যদি অন্যরকম হয়, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের অনুপাত যদি ভিন্ন রকমের হয়—তাহলেই যথেষ্ট ধীশক্তির অধিকারী হবে আধা সাইজের মানুষ।

আর কোনো বক্তব্য আমার নেই। সিদ্ধান্ত নিজেরা নিন। ভিনগ্রহীরা ক্লোনিং-বিজ্ঞানে বিলক্ষণ উন্নত। মানবাকার অমানব যারা সৃষ্টি করতে পারে, স্বচ্ছ চামড়ার মধ্যে দিয়ে অপার্থিব রঙের বিচ্ছুরণ যারা ঘটাতে পারে, তারা কি মগজটাকেও নিজেদের কাজের উপযোগী করে গড়ে নিতে পারে না?

পারে, পারে, অবশ্যই পারে। প্রমাণ চান তো চলে যান অভিশপ্ত-উপত্যকায়, কিম্ভূত প্রহরীর রক্ত সংগ্রহ করুন। নিশ্চয় দেখবেন সেই একই অজানা রঙের অস্তিত্ব রয়েছে রক্তের মধ্যে।

বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, হিউসটনে পাওয়া রক্তের মধ্যেও এই অজানা রঙ দেখা গেছে!
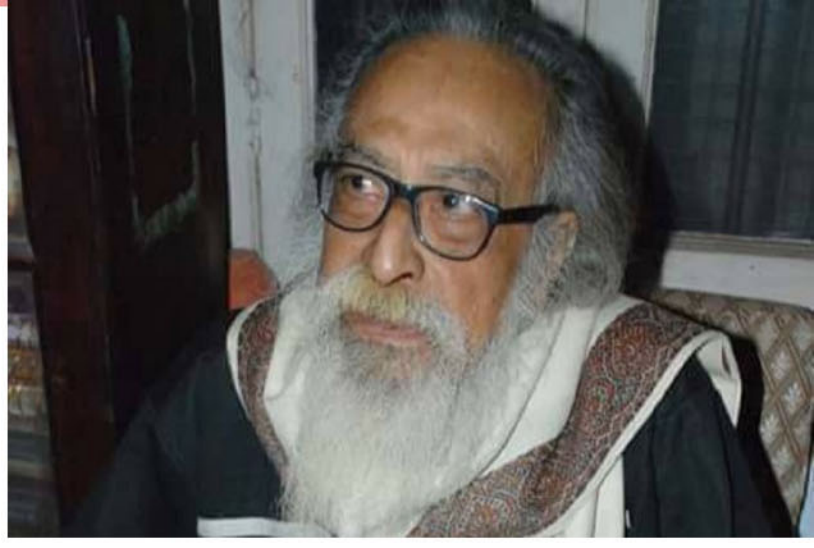
'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধটার স্রষ্টাও তিনি। শুধু সাহিত্যের আকারে বাঙালিকে কল্পবিজ্ঞান পড়তে শেখানোই নয়, তিনি বাঙালি পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সোমবার গভীর রাতে প্রয়াত হলেন অদ্রীশ বর্ধন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বস্তুত বাংলাতেও যে বিজ্ঞানচর্চা হতে পারে কিংবা বিজ্ঞানে বাংলার অবদানের কথা বারবার তাঁর কলমে উঠে এসেছে। অদ্রীশ বর্ধনের লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, বহু কঠিনতম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেও তিনি সাহিত্যগুণের মাধ্যমে অত্যন্ত সরল, সহজ করে তুলতেন পাঠকদের কাছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তো বটেই, অদ্রীশ বর্ধন জন্ম দিয়েছিলেন কত সব মায়াবী চরিত্রের। ফাদার ঘনশ্যাম, জিরো গজানন, চাণক্য চাকলা, নারায়ণী ও ইন্দ্রনাথ রুদ্রর মতো চরিত্র বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল হটকেক।

কল্পবিজ্ঞান নিয়েই তাঁর কার্যকলাপ মূলত ঘোরাফেরা করলেও অদ্রীশ বর্ধন কিন্তু গোয়েন্দা চরিত্রও নির্মাণ করেছেন একের পর এক। ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়াও অনুবাদ করেছেন বহু বিদেশী সাহিত্যও।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়